
ব্লক-২ □ একক: ১ ছেলেভুলানো ছড়া এবং লোকসঙ্গীত:
ছেলেভুলানো ছড়া ও লোকগান- ভাটিয়ালি গান

BL-2 UNIT-1

গঠন

- ২.০ উদ্দেশ্য
- ২.১ প্রস্তাবনা
- ২.২ মূল পাঠ (ছেলেভুলানো ছড়া)
- ২.৩ সারাংশ (ছেলেভুলানো ছড়া)
- ২.৪ মূল পাঠ (ভাটিয়ালি গান)
- ২.৫ সারাংশ (ভাটিয়ালি গান)
- ২.৬ সারসংক্ষেপ
- ২.৭ নির্বাচিত পাঠ্য
- ২.৮ উত্তর সংকেত

২.০ উদ্দেশ্য

ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের একটি সর্বজনীন চিত্র ধরা পড়ে। সেখানে মা ও সন্তানের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা-প্রীতির যে সহজ হৃদয়স্পর্শী এক সুগভীর ঠাট খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি সমাজের বহুমাত্রিক রূপ আমাদের নজর কাড়ে। ছড়ার মধ্যে দিয়ে তাই সমাজের গতিপ্রকৃতি আমাদের কাছে ধরা পড়ে। সমাজের বহুস্তরীয় অবস্থার শুধু নয় সমকালীন একটি আর্থ-সামাজিক সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও এই ছড়াগুলিতে ধরা আছে। তাই এই এককটি পাঠ করলে আপনি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়াগুলির মধ্যে---

- বাঙলার লোকসাহিত্যের ধারার একটি উপশাখার কথা বলতে পারবেন।
- একটি ইতিহাস এবং প্রাচীন সমাজ চিত্র, লোকজীবনের ইতিকথা, অর্থনৈতিক স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হবেন।
- মা, মাসি, পিসি, ঠাকুরমা, দিদিমা ও শিশুমনের অন্তঃপুরের সাক্ষাৎ পাবেন।
- শিশুমনে যেমন একটির পর একটি অসংলগ্ন ভাবের উদয় ঘটে ঠিক তেমনি ছড়াগুলির মধ্যেও সেই অসংলগ্নতার পরিচয় পাবেন।

- লোকসংগীত তথা ভাটিয়ালি গানের বৈশিষ্ট্য ও লোকসমাজের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক বিষয়ে অবগত হবেন।
- ভাটিয়ালি গানের পাঠের মাধ্যমে 'ভাটির দেশ' সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২.১ প্রস্তাবনা

ছড়ার সঙ্গে শিশুর যোগসূত্র খুব ঘনিষ্ঠ, নিবিড়। কারণ, প্রতিটি ছড়াতে শিশু শেষ কথা অর্থাৎ ছড়ার কেন্দ্রবিন্দু শিশু। বহুকাল আগে থেকে আমাদের দেশে মাতৃভাষায় এই ছড়াগুলি সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। ছড়া আসলে গ্রাম্য কবিতা। সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি; ছটা সংস্কৃত-ছড়া প্রাকৃত-ছড়া দেশজ। যার অর্থ, পরম্পরা বা গ্রাম্য কবিতা। মা মাসি পিসি ঠাকুমাদের অভিজ্ঞতা (দৈনন্দিন জীবনে গার্হস্থ্য বিষয়ে, হাসি কান্না, ঝগড়া, বিবাদ, খুনসুটি, উৎসব, মেলা-পার্বণ, অবসর যাপন) সূত্রেই মৌখিকভাবে ঠোঁটস্থ এই সমস্ত ছড়ায় এসেছে প্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত, পশুপাখি, প্রিয়জন, ঘরে-বাইরের নানান বিষয়। লোকভাষায় রচিত এই ছড়াগুলিকে বিষয়ভিত্তিক নানা কারণে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, ঘুমপাড়ানি ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া, পরিবার, কন্যা বা নারী, পশুপাখি, প্রাকৃত জগত সম্বন্ধীয় কিংবা বর্তমান সময়ের নানান সাহিত্যিক ছড়া। তবে এইসকল ছড়াকে বিশদে নিরীক্ষণ করলে এদের মধ্যে দুটি বিষয় পাওয়া যায়। এক: লোকমুখিনতা, দুই: লৌকিক জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

ছেলেভুলানো ছড়া হল শিশুর মানসিক আহার। উক্ত আহারের পুষ্টিগুণ তার মনকে করে সতেজ, চনমনে, সবল। স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে অবাধ বিচরণে শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ হয়। কল্পনাশক্তি এবং উপভোগ্যতায় এই ছেলে ভুলানো ছড়ার কোনো বিকল্প হয় না। স্থান-কাল ভাষা ছন্দ নির্বিশেষে শিশুর অন্ত:প্রকৃতির অখন্ড ঐক্য ছেলেভুলানো ছড়াতে প্রতিফলিত। এক সময় ছড়াকে মনে করা হত কেবলই শিশুসাহিত্য। কিন্তু সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে, বাংলা সাহিত্যে ছড়া নিজস্ব স্থান লাভ করেছে।

লোকসংগীত এর মূলে রয়েছে কার্যত মানব সমাজ ও সভ্যতার উষালগ্নের পরিচয়। দুই বাংলার আঞ্চলিক লোকসংগীত গুলির মূলত চারটি প্রবাহ বা ধারা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল ভাটিয়ালি, বাউল, ঝুমুর ও ভাওয়াইয়া। এই সঙ্গীত গুলি মুহূর্তের প্রেরণায় মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত। গ্রামীণ জনমানুষের এক প্রকার 'অশিক্ষিত পটুত্বের' কাহিনী স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করতেই হয়। বংশ-পরম্পরাক্রমে স্মৃতির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে লোকসংগীতগুলি।

নদীমাতৃক বাংলার মূল লোকসঙ্গীতের সুর হল ভাটিয়ালি। 'ভাটির দেশে' নদীর জোয়ার-ভাটা'র অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোত, শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, মাঝি মাঝার সহজ প্রেম, অনুভূতি, ভালোবাসা, ভক্তির নানা কথা সরল সৌন্দর্যে প্রকাশ পায় এই ভাটিয়ালি সুরের মধ্য দিয়ে। সংগীতই তাদের জীবন। বাংলাদেশের বয়াতি ও গায়নদের গানের মূল সুর ছিল ভাটিয়ালি। পরবর্তীতে গানগুলি 'ভাটিয়ালি' নামে পরিচিতি লাভ করে। ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে এই সুরের পাঁচটি ধাঁচ বা ধরন লক্ষ্য করা যায়-(ক)সুযঙ্গ (খ)ভাওয়াইল্যা (গ)বিক্রমপুইরা (ঘ)বাখরগঞ্জী (ঙ) গোপালগঞ্জী। এই

ধরনগুলির পার্থক্য গায়কের উচ্চারণভঙ্গী, শিক্ষা, ও কণ্ঠস্বরের উপরে নির্ভর করে। ধরনগুলিতে আবার চারটি লহর থাকে যেমন;(ক) ঝাঁপলহর (খ)ফেরুসাই (গ)বিচ্ছেদলহর (ঘ)সারীলহর। লহর বা টানগুলি নির্ভর করে গানগুলির ছন্দের উপরে। এই এককে আমরা আলোচনা করব একদিকে নির্বাচিত ছেলেভুলানো ছড়াগুলি-- একই সঙ্গে ভাটিয়ালি গানগুলি; যেখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শত শত বছরের ইতিহাস, মানুষের সামাজিক অবস্থান, সংস্কৃতি, লোকজীবনচর্চার ধরন-ধারণ, রূপ। বাংলার ছড়া এবং লোকগানগুলি এই সব সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে চলেছে বহু যুগ ধরে।

২.২ মূল পাঠ: (ছেলেভুলানো ছড়া)

ছড়া ১

প্রথম পাঠ:

ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি

মোদের বাড়ি এসো,

খাট নাই পালং নাই

খোকর চোখে বসো।

বাটা ভরে পান দিবো

গাল ভরে খেয়ো,

খোকর চোখে ঘুম নাই

ঘুম দিয়ে যেয়ো।

২.৩ অর্থ (ছেলেভুলানো ছড়া)

‘ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি মোদের বাড়ি এসো’-এই একটিমাত্র মূলপদ অবলম্বন করেই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ছড়া রচিত ও চিত্র পরিকল্পিত হয়েছে। আসলে, জেগে থাকা শিশুকে ঘুম পাড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখনই ঘুমলোকের দূতীকে আহ্বান জানানো হয়। আর এই নিদ্রালোকের দূতীই কখনো কখনো ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আবার কখনো কখনো শিশুর ঘুমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা স্বয়ং। তখন পান খাওয়ানোতে বাঙালির অতিথিপরায়ণতার পরিচয় ছিল। একদিকে সাধারণ গৃহস্থের দারিদ্র্যের ইঙ্গিত— খাট-পালঙ্কের অভাব, অন্যদিকে কল্পনাপ্রবণ মানুষ ঘুমপাড়ানি

মাসি-পিসিকে সে-অভাব পূরণ করার জন্য চোখ পেতে বসতে দিতে চায়। ঘুমের দেবীর চোখ পেতে বসার মধ্যে কল্পনাপ্রবণ শিশুমন মুক্তির স্বাদ পায়।

দ্বিতীয় পাঠ:

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো।

বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।।

শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেসম মেখে নেয়ো।

শীতল পাটি পেড়ে দেবো পড়ে ঘুম যেয়ো।।

আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।

চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে।।

দুই দুই বাঁদি দেব পায়ে তেল দেবে।।

উরকি ধানে মুড়কি দেব নারেক ধানের খই।

গাছপাকা রস্তু দেব হাঁড়ি ভরা দই।।

আত্মীয়-পরিজন বেষ্টিত তখনকার বাঙালি শিশু। তাই ঘুম পাড়াতে মাসিপিসির ডাক পড়েছে। এই পর্যায়ের ছড়াগুলিতে শব্দচিত্র ও অনুপ্রাসের ব্যবহারে সুরের একটি মায়া জাল বুনে শিশুকে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে। মা, মাসি, পিসি, দিদিমা, ঠাকুমাদের কোমল স্নেহে দুলতে দুলতে ঘুমের দেবীকে নিয়ে ঘুমের ন্যায় বিলাসের একটি সম্পূর্ণ চিত্র দেখা যায় এসব ছেলেভুলানো ছড়াগুলিতে। প্রাচীন বাংলায় যানবাহন তেমন ছিল না। তাই মাসিপিসির কষ্ট লাঘব করতে চার-চার বেহারা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে যারা তাঁদের কাঁধে করে নেবে। দুই-দুই বাঁদি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে যারা মাসিপিসির পা টিপবে। তাছাড়া খাদ্যবিলাসী বাঙালি খই-মুড়কি দই-কলায় এক লোভনীয় জলযোগের আভাসও পান। প্রাচুর্য নয়, কিন্তু বাৎসল্যপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয়ে শিশু নিশ্চিন্ত হয়।

ছড়া ২

প্রথম পাঠ:

খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?

ধান ফুরুল, পান ফুরুল, খাজনার উপায় কী?

আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।।

ধনিয়া পিঁয়াজ গেছে পচে সরষে খেতে জল।

খরা-বন্যায় শেষ করিল বর্ষার ফসল।।

ধানের গোলা, চালের বুড়ি সব শুধু খালি।

ছিন্ন কাপড় জড়িয়ে গায় শত শত তালি।।

সারাংশ:

কৃষিজীবী বাঙালির জীবন সংগ্রামের কথা এখানে। ক্ষেতের ধান যখন পেকে আসে, ফসল তোলার সময় হয়ে আসে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি এসে সেই পাকা ধান খেয়ে যায়। বুলবুলির হাত থেকে পাকা ধান বা শস্য রক্ষা করা কৃষকের পক্ষে খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর মারাঠা বর্গীরা দেশে লুটপাট শোষণ করে নিয়ে যায়, তার ওপর খরা আর বন্যায় বাকি সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অর্থনৈতিক এই সংকটের শেষ থাকে না। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে এই হাহাকারও জায়গা করে নিয়েছে। অর্থবোধ না হলেও ছন্দের দোলায় আর সুরের ওঠানামায় এক সময় শিশু ঘুমের রাজ্যে ভেসে যায়।

দ্বিতীয় পাঠ:

মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী আ'ল দ্যাশে।

টিয়ায় ধান খাইলে খাজনা দেবো কিসে।।

তৃতীয় পাঠ:

আয় ঘুম যায় ঘুম বগী এল দেশে।

চড়াই পাখী ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।।

বহু বিতর্কিত এবং আলোচিত এই ছড়াটির স্থান অনুসারে একাধিক পাঠ দেখতে পাওয়া যায়। বুলবুলি পাখি সম্পর্কে যে মিথ্যা কলঙ্ক পোষণ করা হয়েছে তা বাংলায় বগী আক্রমণের প্রসঙ্গে উত্থাপিত। পূর্ব বাংলার ছড়াগুলির প্রথম দুটি লাইনে পাঠান্তর কোথাও কোথাও বগী শব্দটি 'গরকী' এবং বুলবুলি স্থলে গুলগুলি কখনো আবার 'টিয়া' চড়াই পাখিতে পরিণত হয়েছে। শস্য বিনাশকারী পাখি হিসেবে টিয়ার পরই চড়াই এর কথা আসে। আসলে একটি স্বতন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়েই জনমানসের রূপান্তরশীলতা ও বাস্তবমুখিনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াবার জন্য বাঘ, ভূত, দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতির কথা বলে ভয় দেখানো হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বগীর আক্রমণকে ঠিক তেমনভাবেই দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ বগী আক্রমণ এবং তার প্রভাব বাংলার জনমানস ভুলতে পারেনি-- গাঁথে আছে তাদের লোকচিত্রে। বিশেষত নিরাপত্তার অভাব, রাষ্ট্রনৈতিক অত্যাচার, অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রভৃতি বাংলার আপামর পল্লী জীবনে, বিশেষত নারী সমাজের মধ্যে চরম প্রভাব ফেলেছিল। সুতরাং অচিরেই এ বিষয়গুলি ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে স্থান পেয়েছে। বোঝা যায় ইতিহাসের কোন পর্যায়ে এই জাতীয় ছড়া লেখা হয়েছিল। কোনো কোনো অঞ্চলে এই ছড়াগুলি দীর্ঘায়িত হয়েছে অর্থাৎ আরও কয়েকটি পদ মূল ছড়াটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটি ছড়া সম্পর্কিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

ছড়া ৩

একই অঞ্চল থেকে ছড়াগুলির অনেক ভিন্ন ভিন্ন পাঠ সংগ্রহ করা যায়।

প্রথম পাঠ

আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াডুম সাজে।

লাল মিরগেল ঘাঘর বাজে।।

বাজতে বাজতে এল ডুলি।

ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।।

কমলাপুলির বিয়েটা।

সূর্য মাঝার টিয়েটা।।

হাড় মুড়মুড় কেলৈ জিরে।

কুসুম কুসুম পানের বিড়ে।।

রাই রাই রাই রাবণ।।

হলুদ ফুলে কলুদ ফুল।

তারার নামে টগর ফুল।

এক গাচি করে মেয়ে খাড়া।

এক গাচি করে পুরুষ খাড়া।।

জামাই বেটা ভাত খাবি তো এখানে এসে বস।

খা গন্ডা গন্ডা কাঁঠালের কোষ।। _রবীন্দ্র-সংগ্রহ

দ্বিতীয় পাঠ

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।

ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।।

বাজতে বাজতে চলল ডুলি।।

ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।।

কমলাপুলির টিয়েটা।

সূর্যমাঝার বিয়েটা।।

আয় রঙ্গ হাটে যাই।

গুয়া পান কিনে খাই।।

একটা পান ফোপরা।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।।

কচি কচি কুমড়োর ঝোল।

ওরে খুকু গা তোল।।

আমি তো বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দে।।

হলুদ বনের কলুদ ফুল।

তারার নামে টগর ফুল।।

-রবীন্দ্র-সংগ্রহ

উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে মূল পাঠ কোনটি সে বিষয়ে মতামত পোষণ করা খুবই অসম্ভব কাজ। আবার কোন একটি পাঠকে বিচার করে অন্য পাঠগুলিকে বর্জন করা উচিত নয়। উদ্ধৃত পাঠগুলির পরিষ্কার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। আপাতভাবে একটি অর্থ এইভাবে অনুমান করা যেতে পারে—

প্রথম ছত্রটিতে 'বিবাহ যাত্রার বর্ণনা' অর্থে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, অভিজাত পরিবারের বিয়ের শোভাযাত্রা যুদ্ধযাত্রারই একটি নামান্তর ছিল। সমাজে সেই সময় বলপূর্বক কন্যা অপহরণ করে বিয়ে করার প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং যুদ্ধযাত্রা ও বিবাহ যাত্রায় বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত না। অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল অগ্রবর্তী এবং পার্শ্ববর্তী রক্ষী হিসেবে থাকত। আবার এই ছড়াটির সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি খেলার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে; কোনো বৃষ্টির দিনে, দুপুরবেলা যখন বাড়ির ছেলে মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারে না তখন ঘরের মধ্যেই মেঝেতে বৃত্তাকারে বসে তারা এক ধরনের খেলা খেলত ছড়া আবৃত্তির ছন্দে ছন্দে। এইভাবে ক্রমাগত ছড়াগুলির অর্থ ও পাঠান্তর হতে থাকে। কিন্তু ছড়াটির মধ্যে একটি বিয়েকে উপলক্ষ করে যে আনন্দানুষ্ঠান, এমনকি বিয়ে করাই যে বাংলার সমাজে পুরুষের বীরত্বের স্বীকৃতি ছিল, সেটা বেশ বোঝা যায়। সূর্য্যমামার বিয়ে উপলক্ষ্য করে ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝর বাজছে। পান-সুপারি এখানেও ছড়ার অন্তর্ভুক্ত।

অপর একটি প্রচলিত পাঠ:

আগাডোম বাগাডোম

ঘোড়ার ডোম সাজে

ডান মিরগেল ঘাগর বাজে।

বাজতে বাজতে চলল ঢুলি,

ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি,

কমলাপুলির টিয়েটা।

সূর্য্যি মামার বিয়েটা।

হাড় মড় মড় কেলৈ জিরে

রসুন কুসুম পানের বিড়ে,

আয় লবঙ্গ হাটে যাই

ঝালের নাড়ু কিনে খাই।

ঝালের নাড়ু বড় বিষ,

ফুল ফুটেছে ধানের শিষ।

সারাংশ:

ডোমরা বীর যোদ্ধা ছিলেন। ডোম যোদ্ধারা প্রাচীনকালে কিভাবে যুদ্ধের শোভাযাত্রায় যেতেন তার সুনিপুণ বর্ণনা দেখতে পাই এই ছড়াটিতে। রাজারা কোন সময় যুদ্ধ করতেন সে বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাই। এই ডোম সৈন্য বাহিনীর দ্বারা কমলাপুলি অতিক্রমের সময় হল সকাল অর্থাৎ 'সূর্য্যি মামার বিয়ে'। এটি শরৎকাল। কারণ, ধানের শীষে ফুল ফুটেছে। বিপক্ষ সৈন্যেরা ডোম সৈন্যদের খাদ্যে বিষ মিশিয়েছে(ঝালের নাড়ু বড় বিষ)। লবঙ্গ নামক যে গুণ্ডচর মোতায়ন করা হয়েছে, তিনি পরীক্ষা করে এই তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন।

অনুশীলনী-১

নিচের প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর দিন। উত্তর দেওয়া হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিচের দেওয়া বিবৃতি গুলির সঠিক উত্তরটি ডান দিকে দেওয়া ঘর গুলিতে ঠিক চিহ্ন(✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) ঢুলি গেল সেই শেওড়াফুলি।

ঠিক

ভুল

☐☐

খ) ঝালের নাড়ু কিনে খাই।

☐☐

গ) ফুল ফুটেছে গমের শীষ।

☐☐☐☐

ঘ) বাটা ভরে সুপারি দিবো।

ঙ) খোকা ঘুমালো পাড়া ঘুমালো।

চ) খাট নাই, পালং আছে।

ছ) সূর্য মামার বিয়ে।

জ) আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।

ঝ) উরকি ধানে মুড়কি দেব নারঙ্গ ধানের খই।

২। সঠিক উত্তরটির ডানদিকের ঘরে ঠিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) লবঙ্গ যেখানে যায়

মাঠে

ঘাটে

হাটে

বাটে

খ) সূর্যমামার কিসের কথা বলা হয়েছে?

ঝি়ের

বিয়ের

টিয়ের

মায়ের

গ) খোকাকর কোথায় বসার কথা বলা হয়েছে?

মাথায়

হাতে

সামনে

চোখে

ঘ) খোকাকে কারা ঘুম পাড়ায়?

বাবা-ঠাকুরদা

কাকু জেঠু

মামা মামি

মাসি পিসি

ঙ) ধান খেয়েছে-

টিয়া

ময়না

বুলবুলি

পায়রা

চ) খরা বন্যায় শেষ হয়েছে-

শীতের ফসল

বর্ষার ফসল

হেমন্তের ফসল

গ্রীষ্মের ফসল

ছ) শান বাঁধানো যা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পুকুর

নদী

ডোবা

ঘাট

জ) আম-কাঁঠালের বাগান দেব-

মায়ায় যাবে

ছায়ায় যাবে

কায়ায় যাবে

আম খেয়ে যাবে

ঝ) চার চার বেয়ারা দেব-

কাঁধে করে নেবে

ঝুলিয়ে নেবে

মাথায় নেবে

কোলে নেবে

৩। নিচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ ডানদিকের ঘরে লিখুন।

ক) কেনা

খ) বিষ

গ) যাওয়া

ঘ) মোদের

ঙ) খোকা

চ) দেশ

ছ) খালি

জ) ঘুমালো

ঝ) চলল

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) বাটা ভরে _____ দিবো।

খ) খাট _____ পালং নাই।

গ) খোকার চোখে _____ নাই।

ঘ) সূর্যিমামার _____।

ঙ) ঝালের নাড়ু বড় _____।

চ) বুলবুলিতে _____ খেয়েছে।

ছ) খরা-বন্যায় শেষ করিল _____ ফসল।

জ) ধনিয়া পিঁয়াজ গেছে _____।

ঝ) বগী এল _____।

২.৪ মূল পাঠ: (ভাটিয়ালি গান)

গান ১

নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া দে

ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া চলুক মাঝ দইরা দিয়া।।

উড়ালি বিড়ালি বাওয়ে নাওয়ের বাদাম নড়ে (আরে)।

আথালি পাথালি পানি ছলাং ছলাং করে রে।

আরে খল খলাইয়া হাইসা উঠে

বৈঠার হাতল চাইয়া হাসে, বৈঠার হাতল চাইয়া।।

চেউয়ের তালে পাওয়ের ফালে নাওয়ের গলুই কাঁপে

তির তিরাইয়া নাওয়ের খৈয়াই রৌইদ তুফান মাপে,

মাপে রৌইদ তুফান মাপে

চিরলি পিরলি পুলে ভ্রমর-ভ্রমরী খেলে রে (আরে)।

বাদল উদালি কায়ে পানিতে জমিতে হেলে রে

আরে তুর তুরাইয়া আইলো দেয়া দীপ্তি হাতে লইয়া

আইলো দীপ্তি হাতে লইয়া।

শালি ধানের শ্যামলা বনে হইলদা পঙ্খি ডাকে
চিকমিকাইয়া হাসে রে চান শইশা ক্ষেতের ফাঁকে
ফাকে সইশা ক্ষেতের ফাঁকে।

সোনালি রূপালি রঙে রাঙা হইলো নদী (আরে)।
মিতালি পাতাইতাম মুই মনের মিতা পাইতাম যদি রে
আরে বিলমিলাইয়া খালর পানি নাচে থেইয়া থেইয়া
পানি নাচে থেইয়া থেইয়া।।

২.৫ সারাংশ (ভাটিয়ালি গান)

নৌকো আর বেঁধে রেখো না ছেড়ে দাও। পাল উড়িয়ে দাও। স্রোতে ছলাৎ ছলাৎ করে নদীর মাঝ বরাবর এগিয়ে
চলুক। চঞ্চল জলস্রোত বৈঠা কে স্পর্শ করে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে। ঢেউয়ের তালে তালে নৌকার গোলই বা গলি
কাঁপতে থাকে। শালি ধানের শ্যামলা বনে হইলদা পঙ্খী আহ্বান করে। এবং সরষে ক্ষেতের ফাঁক দিয়ে চাঁদ
ঝিকমিক করে। সোনালি রূপালি রঙে নদী রঙিন হয়ে যায়। আহা! এই প্রকৃতির সৌন্দর্যক্ষেপে যদি মনের মত
সখা পেতাম!

গান ২

সোনার বাস্কাইলা নাও
পিতলের গুড়া, পিতলের গুড়া রে
ও রঙের গুড়া দৌড়াইয়া যাও।
বন্ধুর দেশে যামু আমি কর তাড়াহুড়া
ও কি ও, ও ও রঙের গুড়া দৌড়াইয়া যাও।
সোনার বাস্কাইয়া নাও
পিতলের গুড়া পিতলের গুড়া রে
ও রঙের ঘোড়া দৌড়াইয়া যাও।
পিরিত রতন পিরিত যতন পিরিত গলার হার

পিরিত কাঞ্চন পাইলা যেজন
সফল জনম তার রে
দুনিয়া পিরিতির বাজার।
বন্ধুর দেশে যামু কিরে কর তারাছড়া
পান খাইতে সুপারি লাগে আর লাগে চুন
ঘষিয়া ঘষিয়া জ্বলে পিরিতির আগুন রে
রঙ্গিলা ও রঙ্গে বাইয়া যাও।
কই মজে কইয়ের ত্যাগে, মাগুর মজে ঝোলে
রসিক মরে প্রেমের জ্বালায় ফড়িং মরে ফান্দে রে
রঙ্গিলা ও রঙ্গে বাইয়া যাও।
অ্যালং মাছের ত্যালং ত্যালং, পাবদা মাছের রসা
নতুন মাইয়ার বুইরা জামাই নিভ করে গোসা রে
বৈঠা না ফালাইতে নাওয়ার শূন্যে করে উড়া।
বন্ধুর দ্যাশে যামু আমি বড় তাড়াছড়া।।

সারাংশ:

সোনা দিয়ে বাঁধানো নৌকায় পিতলের ঘোড়ার মুখ। নাও ভাসবে জলে। বন্ধুর দেশে যাওয়ার সময় তাড়াছড়ার অন্ত থাকে না। পিরিত-প্রেম ছাড়া মানব জীবন বৃথা। তাই পিরিতই রতন, পিরিতই যতন। পিরিত গলার হার। হার যেমন গলার শোভা প্রদান করে, প্রেমও মানুষের মনের শোভা বৃদ্ধি করে। যিনি এই পিরিত কাঞ্চন পেয়েছেন তাঁর মানব জন্ম সার্থক হয়েছে। পান খেতে সুপারি ও চুন লাগে। পিরিতের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলে। নববধূর বৃদ্ধ স্বামী। প্রতিনিয়ত অভিমান করে। সখ্যতা জন্মায় না। ঠিক যেমন বৈঠা জল স্পর্শ করে নিমেষেই শূন্যে উঠে যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভাটির গান ভাটিয়ালি। নদীর স্রোতের কথা, মাছের কথা, নৌকার কথা, প্রেমের কথার সঙ্গে থাকে কখনো হালকা, কখনো গভীর জীবনদর্শন। একটা স্রোতের টান গানের সুর আর লয়ের শরীর জুড়ে থাকে।

নিচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর দিন। উত্তর দেওয়া গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিচের দেওয়া বিবৃতি গুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে ঠিক(✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
ক) নাওয়ার গলুই কাঁপে।	☐	☐
খ) বৈঠার হাতল চাইয়া কাঁদে।	☐	☐
গ) নাও মাঝ দরিয়া দিয়া চলুক।	☐	☐
ঘ) সোনালী রূপালি রঙে রাজা হল নাও	☐	☐
ঙ) শালি ধানের হইলদা বনে শ্যামলা পক্ষী ডাকে।	☐	☐
চ) পানি নাচে হেইয়া হেইয়া।	☐	☐
ছ) রঙের গুড়া দৌড়াইয়া যায়।	☐	☐
জ) পিরিত গলার হার।	☐	☐
ঝ) ঘষিয়া ঘষিয়া জ্বলে পিরিতির আগুন।	☐	☐

২। নিচের বিবৃতিগুলির ডান দিকের ঘরে টিক(✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) মাগুর মাছ মরে

ঝোলে

তেলে

ঘিয়ে

জলে

খ) নাও খানি কিসের?

রূপার

সোনার

তামার

লোহার

গ) রঙের গুড়া যায়-

দৌড়াইয়া

গড়াইয়া

বিশ্রাম নিয়া

হাইটা

ঘ) বন্ধুর দেশে যাওয়ার সময় বড়-

তাড়াহুড়া

হুড়াহুড়ি

দৌড়াদৌড়ি

ছুটাছুটি

ঙ) নাও কোথা থেকে চালাতে চায়?

নদীর তীরে

মাঝ দরিয়ায়

স্রোতের অনুকূলে

স্রোতের প্রতিকূলে

চ) শালি ধানের শ্যামলা বনে কেমন পঙ্খি ডাকে?

শ্যামলা

হইলদা

রাঙা

সাদা

ছ) বৈঠা না ফালাইয়েতে নাওয়ের কোথায় করে উড়া?

গাছে

শূন্যে

আকাশে

মহাকাশে

জ) পাবদা মাছের-

রসা

কষা

ঝোল

ঝাল

ঝা) রসিক মরে কিসের জ্বালায়?

খিদের জ্বালায়

প্রেমের জ্বালায়

চোখের জ্বালায়

রোদের চালায়

দুই বাংলার বৃহৎ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল জুড়ে যে একটি অখন্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছে তার মূলে যেমন রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলগান ইত্যাদির প্রভাব সক্রিয় ছিল ঠিক একই রকম অবিভক্ত বাংলার ছড়াগুলির প্রভাবও সমান্তরালে সক্রিয় ছিল। পূর্ব ভারতের সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল জুড়ে কৃতিবাসী রামায়ণ ও মনসামঙ্গলের পুথির সন্ধান যেমন পাওয়া যায় সেই ভাবে ছেলেভুলানো ছড়া গুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বাংলার ভূগোলের প্রতিটি আনাচে-কানাচে। ছড়া ও গানগুলি এতটাই জনপ্রিয় যে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গাতে প্রচলিত আছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, ঘটনা ও স্বল্প কিছু শব্দের পরিবর্তনীয় রূপে।

ছড়ার মধ্যে মা, মাসি, পিসির চিরন্তন স্নেহাঙ্গীত সরল মধুর কণ্ঠস্বর সুপ্রাচীন কাল থেকেই ধ্বনিত হয়ে আসছে। ঘুমপাড়ানি ছড়া গুলির মধ্যে এক আশ্চর্য মনস্তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। শিশু এখানে উপলক্ষ মাত্র। মাতৃস্নেহের উষ্ণ উত্তাপ আর ভালোবাসার অন্তরঙ্গতায় হৃদয়ের সুর ও স্বরে অলৌকিক বস্তু শিশুকে কল্পনালোকে নিয়ে যায়। পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মিশিয়ে ছড়ার মহামন্ত্র রূপ সৃষ্টি হয়। কোথাও মা, মাসির অনুগত আবেদন গীতিময়তার সঙ্গে অন্তরের উষ্ণ অনুভূতি উৎসারিত করে। ঘুমপাড়ানি ছড়ার আবেদন তাই চিরন্তন, শাস্বত। আবার; বর্গীর হাঙ্গামার প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের জেলাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু মোগল শাসনের পরবর্তী সময়ে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত পরিবর্তিত আইনগুলি, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তন করেছিল তাকেই তুলনায় এনেছে চিরায়ত বাংলার মানুষ অত্যাচার শোষণের প্রতি তুলনায়। কর আদায়ের বীভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলা ব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। তা দমন করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ এবং ব্যয় ভার বহনের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হলো। পূর্বে অত্যাচারের কারণ ছিল বহিরাগত মারাঠা বর্গীর দল। কিন্তু এখন অত্যাচারের সেই স্থান দখল করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরূপী টিয়া পাখি, চড়ুই প্রভৃতি। পরিবর্তনের এই ইঙ্গিত টুকু বুলবুলি থেকে টিয়া পাখিতে স্থান গ্রহণ করে ধরা পড়েছে কোথাও কোথাও। ছড়াগুলিতে দেখা যায়, অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল সহযোগে অভিজাত পরিবারের বিয়ের শোভাযাত্রা যুদ্ধযাত্রারই একটি নামান্তর ছিল। যুদ্ধ যাত্রা ও বিবাহ যাত্রার পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু ছড়ার মধ্যে দেখানো হয়েছে বিবাহ একটি বীরত্বের প্রতীক। এবং সেই উপলক্ষে আনন্দ অনুষ্ঠানে ঢাক ঢোল মৃদং বাজছে।

ভাটিয়ালি গান ও সুরে গভীর জীবনদর্শনের আভাস মেলে। নৌকার বাঁধন খুলে দাও। পাল উড়িয়ে দাও। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহ, মায়া, ডাক দেয় অসীমের দিকে। সোনালি-রূপালি রঙে রাঙা নদীহৃদয়। হায়! এমন সময় প্রাণের সখা যদি থাকত পাশে! কখনো আবার, বন্ধুর দেশে যাওয়ার সময় তাড়াহুড়োর শেষ থাকে না। নৌকাগুলি যেন ঘোড়ার মতো দৌড়ায়। পিরিত আসলে অমূল্য সম্পদ, অলংকার। মনকে অলংকৃত করে। যার মনে প্রেম, পিরিত আছে, সেই হল ধনী। তার মানব জনম সার্থক। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদানগুলি ভাটিয়ালি গানে ও সুরে জীবন্ত হয়ে আছে। ভাটিয়ালি আসলে নদীর স্রোতের সঙ্গে চলা সুর। এই স্রোতের সাথে মানুষের জীবনের উত্থান পতন, দুর্গম পথ চলার এক অপূর্ব সাদৃশ্য। নদী যেমন সমুদ্রের দিকে চলেছে একইরকম

ভাবে আমাদের জীবনও ক্রমশ পরিণতির দিকে একইভাবে এগিয়ে চলেছে অর্থাৎ যে সময়, যে মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়ে যায় সেটি আর ফিরে আসে না। তাই সেই সময়কে উপভোগ করার আনন্দ-উচ্ছ্বাস গানগুলিতে দেখতে পাই।

অনুশীলনী ৩ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

নিচের প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর দিন। উত্তর লেখা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিম্নলিখিত চলিত শব্দগুলি সাধু শব্দে রূপান্তরিত করুন।

ক) নেই

খ) কিনে

গ) সাজে

ঘ) ফুটেছে

ঙ) যাচ্ছি

চ) যাইল

ছ) বাজতে

জ) বাজতে

ঝ) চলল

২। নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ ডানদিকের ঘরে লিখুন।

ক) বড়

খ) ফুল

গ) ঘোড়া

ঘ) খাওয়া

ঙ) চোখ

চ) ঘুম

ছ) ধান

জ) বিষ

ঝ) বিয়ে

৩। নিচের প্রদত্ত রেখাঙ্কিত শব্দগুলির পদ নির্ণয় করে ডান দিকের ঘর গুলিতে লিখুন।

ক) পিরিত

খ) রঙের গুড়া

গ) দৌড়াইয়া যাও

ঘ) বাজার

ঙ) মুই

চ) কৈয়ের ত্যাল

ছ) শ্যামলা বনে

জ) রাঙা হইল

ঝ) তুফান

২.৮ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী-১

১।

(ক) ভুল

(ঙ) ভুল

(ঝ) ঠিক

(খ) ঠিক

(চ) ভুল

(গ) ভুল

(ছ) ঠিক

(ঘ) ভুল

(জ) ঠিক

২।

(ক) হাটে

(ঙ) বুলবুলি

(জ) ছায়ায় যাবে

(খ) বিয়ের

(চ) বর্ষার ফসল

(ঝ) কাঁধে করে

(গ) চোখে

(ছ) ঘাট

(ঘ) মাসি-পিসি

৩।

(ক) বেচা

(ঙ) খুকি

(ঝ) থামল

(খ) অমৃত

(চ) বিদেশ

(গ) আসা

(ছ) ভর্তি

(ঘ) তাহারে

(জ) জাগল

৪।

(ক) পান

(ঙ) বিষ

(ঝ) দেশে

(খ) নাই

(চ) ধান

(গ) ঘুম

(ছ) বর্ষার

(ঘ) বিয়েটা

(জ) পচে

অনুশীলনী-২

১।

(ক) ঠিক
(খ) ভুল
(গ) ঠিক
(ঘ) ঠিক

(ঙ) ভুল
(চ) ভুল
(ছ) ঠিক
(জ) ঠিক

(ঝ) ঠিক

২।

(ক) ঝোলে
(খ) সোনার
(গ) দৌড়াইয়া
(ঘ) তাড়াহুড়া

(ঙ) মাঝ দরিয়ায়
(চ) হইলদা
(ছ) শূন্যে
(জ) রসা

(ঝ) প্রেমের জ্বালায়

অনুশীলনী-৩

১।

(ক) নাই
(খ) কিনিয়া
(গ) সাজিয়া
(ঘ) ফুটিয়াছে

(ঙ) যাইতেছি
(চ) গিয়াছিল
(ছ) বাজে

(জ) বাজিতে
(ঝ) চলিল

২।

(ক) বৃহৎ
(খ) পুষ্প
(গ) অশ্ব
(ঘ) আহার

(ঙ) নয়ন
(চ) নিদ্রা
(ছ) ধান্য
(জ) গরল

(ঝ) বিবাহ

৩।

(ক) বিশেষ্য
(খ) বিশেষণ
(গ) ক্রিয়া
(ঘ) বিশেষ্য
(ঙ) সর্বনাম

(চ) বিশেষ্য

(ছ) বিশেষণ

(জ) ক্রিয়া

(ক) বিশেষ্য



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

বিএল-২ □ একক-২ প্রবন্ধ : বিচিত্র বাঙালী-- সুভাষ মুখোপাধ্যায়

BL-2 UNIT-2

গঠন

- ২.০ উদ্দেশ্য
- ২.১ প্রস্তাবনা
- ২.২ মূল পাঠ (প্রথম অংশ)
- ২.৩ সারাংশ (প্রথম অংশ)
- ২.৪ মূল পাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
- ২.৫ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
- ২.৬ সারসংক্ষেপ
- ২.৭ নির্বাচিত পাঠ্য
- ২.৮ উত্তর সংকেত

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি-

- বাঙালি জাতির উৎপত্তির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখার সন্ধান পাবেন।
- বাঙালির ভাষাঋণ ও শব্দভাণ্ডারের উৎপত্তিগত ইতিহাসের একটি অধ্যায় সম্পর্কে অবগত হবেন।
- দেশি ও বহিরাগত জাতি, জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ ও মিশ্র সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস জানতে পারবেন।
- বাঙালির মননশক্তির ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- তথ্য প্রমাণের যথাযথ সমাবেশে, ভাবে ভাষায়, চিন্তার সমন্বয়ে এবং পরিচ্ছন্ন গদ্যে কীভাবে প্রমাণসাধ্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

২.১ প্রস্তাবনা

বাঙালি তার জাতিসত্তাকে খুঁজে পেতে নিত্যই অনুসন্ধানী। অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই বাঙালি তার শিকড়ের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছে। যেমন তার সংস্কৃতি, জীবনচর্যা বিষয়ে, তেমনি অর্থনীতি, জাতিসত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের

আলোচনা এ পর্যন্ত অনেকেই করেছেন। নতুন তথ্যের আবিষ্কার নয় বরং তথ্য ও উপাদানের ব্যবহার করে সঠিক ধারণার প্রতিষ্ঠা করতে আমরা আগ্রহী। এ বিষয়ে নীহাররঞ্জন রায়ের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর ‘বাঙালির ইতিহাস’ (আদি পর্ব) গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ এবং প্রামাণ্য কাজ। প্রাচীন বাংলার ভূগোল ও প্রাচীন বাঙালির ইতিহাসকে একটি নতুন যুক্তি পরম্পরায় গেঁথে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থটির একটি সর্বজনবোধ্য সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ একটি সংস্করণ যুক্তি-পরম্পরায় সাজিয়ে তথ্য সহকারে প্রকাশ করেছেন। এ বইটিও ‘বাঙালির ইতিহাস’ নাম ধারণ করেছে। কতদিন ধরে পৃথিবীর কোন-কোন অঞ্চলের মানুষের রক্তধারা বাঙালির চেহারার মধ্যে মিশেছে, ঠিক সেটিই প্রাবন্ধিক তাঁর পাঠকদের সহজ ভাষায় জানিয়েছেন। তিনি বাঙালির জাতি সত্তাকে দেখেছেন, তাকে মিলিয়ে দেখেছেন ভারতের সমগ্র জনসমাজের সাথে তারপর সমগ্র বিশ্বের যেখানে-যেখানে মানুষের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার দিকে চেয়েছেন। যুক্তি ও ভাবের প্রকৃষ্ট বন্ধনের মাধ্যমে লেখক প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ ইতিহাসের কঠিন প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে গবেষক ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় বিশিষ্ট লিখনশৈলীর দ্বারা গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। তাঁর কখনভঙ্গিটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। বাঙালির সঙ্গে তার পরিপার্শ্বের নিবিড় পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ‘ভাঙের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড’। বাঙালির জাতি, সংস্কৃতি, ভাষার উদ্ভবের ইতিহাসকে কয়েকটি রেখায় এই ‘বিচিত্র বাঙালী’ প্রবন্ধটিতে ধরে রেখেছেন লেখক। এই অংশটিতে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে।

২.২ মূল পাঠ (প্রথম অংশ)

বাংলা দেশের দোরগোড়ায় রাজমহল পাহাড়। সেখানে বনে জঙ্গলে থাকে পাহাড়ী জাত মালেরা। দ্রাবিড়-ভাষায় ‘মাল’ বলতে বোঝায় পাহাড়ী। তাদের ছোটোখাটো চেহারা, গায়ের রং মিশমিশে কালো, নাক চ্যাটালো — নিষাদদের যে বর্ণনা বেদে আছে তার সঙ্গে ছবছ মিলে। সিংহলের ভেড়াদের মত দেখতে বলে এদের নৃতাত্ত্বিক নাম ভেড়িড।

এই ‘ভেড়িড’ বা ভেড়াপ্রতিম মানুষেরাই এ দেশের প্রকৃত আদিবাসী। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা ভারতবর্ষেই এক সময়ে তাদের বিস্তৃত বসবাস ছিল। এ দেশের বেশিরভাগ মানুষের রক্তে তাদের রক্ত মিশে আছে।

এতদিন আগের কথা আজ আমরা কেমন করে জানলাম? ছোট ছেলে দেখে যেমন আমরা বলি ‘নাকটা হয়েছে বাপের মত কিন্তু চোখ দুটো হয়েছে মা’র মত’, তেমনি নৃতাত্ত্বিকেরা দেহের গড়ন দেখে বলে দেন কার শরীরে কোন পূর্বপুরুষদের রক্তের ধারা বইছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একেবারে মাটির পেট থেকে যেসব খবর বার করেন, বিভিন্ন জাতের ঠিকুজি কুলজি বার করার ব্যাপারে নৃতাত্ত্বিকদের তা খুবই কাজে লাগে।

যেমন, একটা খবরের কথা ধরা যাক। শিবালিক পাহাড় অঞ্চলে টারশিয়ারি যুগের নরবানরের দাঁত আর চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায়, এদেশে বিবর্তনের ধারায় মানুষের আবির্ভাবের জমি তখন থেকেই তৈরি হচ্ছিল।

একেবারে পুরনো পাথরের যুগ থেকেই এদেশে যে মানুষের বসবাস ছিল তার তো অটেল পাথুরে প্রমাণ ঢের আগেই আমাদের হাতে এসেছে। তাহলে এ-কথা জোর করেই বলা যায়, হিমযুগের পর থেকে এদেশ কখনই জনশূন্য থাকেনি। এখানকার নানা জায়গায় নানা রকম জলহাওয়ায় নানান দলে ভাগ হয়ে মানুষ বসবাস করত। পরে তাদের রক্তে বাইরে থেকে নানান রক্তের ধারা এসে মিশেছে। বাঁচবার আলাদা আলাদা ধরনের দরুণ এবং রক্তে রক্তে মেশামেশি হওয়ায় দেশভেদে চেহারার নানা রকম ধাঁচ দাঁড়িয়ে গেছে। মনের গড়নে, মুখের ভাষায়, সভ্যতার বাস্তব উপাদানে তার প্রচুর ছাপ আছে।

বাংলাদেশের মাটির গুণ আর সেই মাটিতে নানা জাতের মেলামেশা— এরই মধ্যে বাঙালীর জনপ্রকৃতির বৈচিত্র্য আর ঐক্যের গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে।

এদেশে আগে যাদের ‘আদি-অস্ট্রেলীয়’ বলা হত, এখন তাদের বলা হয় ‘ভেডিড’। ‘দ্রাবিড়’ বা ‘আর্য’ আসলে নরগোষ্ঠীর নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠীর নাম। একই নরগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার চলন থাকতে পারে, কাজেই ভাষা দিয়ে নরগোষ্ঠীর নামকরণ করা ঠিক নয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে চেহারার মিল পাওয়া গিয়েছিল বলেই এক সময়ে এখানকার আদিবাসীদের ‘আদি-অস্ট্রেলীয়’ বলা হত।

ভেডাপ্রতিম এই মানুষদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বলতে—মাথার গড়ন একটু বেশি রকম লম্বা, নাক চওড়া, গায়ের রং মিশমিশে কালো, দেখতে বেঁটেখাটো কিংবা মধ্যকায়। মহেঞ্জোদারোর ভগ্নস্তুপে ভেডিড নরমুণ্ড পাওয়া গেছে।

বাঙালী জাতির সব স্তরেই কমবেশি ভেডিড রক্তের খোঁজ পাওয়া গেছে। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আদিবাসীদের তো কথাই নেই, নমঃশূদ্র, পোদ, বাউরি, বাগদী, চন্ডাল প্রভৃতির মধ্যে, এমন কি বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যেও ভেডিড উপাদান রয়েছে।

শুধু এদেশে নয়, এক সময়ে এদেশের বাইরেও পূর্বে-পশ্চিমে ভেডিডদের ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছিল। আরব আফগানিস্তান থেকে শুরু করে মালয়, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এই রক্তধারার প্রচুর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে।

দক্ষিণ ভারতে যাদের দ্রাবিড় বলা হয়, তারা ভেডাপ্রতিম মানুষদেরই বংশধর। পরিবেশের প্রভাবে তাদের চেহারা নানা দিক থেকে বদলে গেছে। জীবনের ধরন বদলালে চেহারার মধ্যেও কিভাবে তার ছাপ পড়ে আমাদের ঘরের কাছে মালপাহাড়ীরাই তার বড়ো প্রমাণ। দুশো বছর আগেও মালেরা আর মালপাহাড়ীরা ছিল অভিন্ন। পাহাড় থেকে নেমে সমতলে বাস করার ভেতর দিয়ে তাদের চেহারার আলাদা ধরন দাঁড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশের লোকজনের মধ্যে আরও একটি রক্তের ধারা বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এই ধারাটির উৎস এদেশের বাইরে—মঙ্গোলীয় বা মঙ্গোলপ্রতিম জাতির মধ্যে। মঙ্গোলীয় আকৃতির বৈশিষ্ট্য হল চোখের বিচিত্র গড়ন, বাদামী রঙের লালচে চোখ আর নেত্রবলি বা চোখের কোনে ভাঁজ। অবশ্য চোখের এই গড়ন সব মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যেই সমান মাত্রায় দেখা যায় না। বাংলাদেশের জনপ্রকৃতিতে যে মঙ্গোলীয় শাখা সব চেয়ে বেশি ছাপ ফেলেছে, তাদের বলা হয় প্যারোইয়ান। নির্ভেজাল প্যারোইয়ান চেহারা দেখতে পাওয়া যায় হোয়াং-হো অঞ্চলের চিনাদের মধ্যে।

আসামের আও-নাগ আর সেমা-নাগাদের মধ্যেও প্যারোইয়ান মার্কামারা চওড়া মাথা আর চ্যাটালো মুখ নজরে পড়ে। গোল বা মাঝারি মাথা, বাঁকা চোখ, দেখতে ছোটখাটো, গায়ের রং ময়লা—এই দেখে প্যারোইয়ান উপাদান ধরা যায়। বাংলার উত্তর আর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে নিম্নবর্ণ হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে এই উপাদান খুব বেশি রকম দেখা যায়। বাংলার কোচ আর রাজবংশীদের খাঁটি প্যারোইয়ান চেহারা। পূর্ববঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মগ প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে মালয়-ইন্দোনেশিয়ান উপাদান বোঝা যায় তাদের অত্যন্ত গোলাকার মাথা, বাদামী গায়ের রং আর ছোটখাটো আকৃতি দেখে। বিশেষত পূর্বাঞ্চলের নানা জায়গায় ভেডডাপ্রতিম জনসাধারণের মধ্যে নানা মাত্রায় মোঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। সাঁওতাল প্রভৃতি মুন্ডাভাষী মানুষদের মধ্যে এই মিশ্রণ ধরা পড়ে। নানা রকমের জল-হাওয়ায় জীবনের বিচিত্র ধরনের মধ্যে চেহারার এত বদল হয়েছে যে কোথায় কতটা পরিমাণে এই রক্তধারা মিশে আছে সঠিকভাবে বলা শক্ত।

ভেড্ডিড এবং দ্রাবিড় ছাড়াও ভারতীয় জনদেহে আরেকটি দীর্ঘমুণ্ড ধারা নজরে পড়ে। এই ধারাটি ‘আর্য’ বা ‘ইন্দো-আর্য’ নামে পরিচিত। সম্ভবত তিন হাজার বছর আগে আরল-কাশ্যপ সাগরের কোল থেকে এদের সব চেয়ে বড় দলটা এদেশে এসেছিল। তার আগেও ছোট ছোট দল এসে থাকতে পারে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ‘ইন্দো-আর্য’ বা ভারতীয় বৈদিক আর্যরা এদেশে ঢোকে। পরে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। এই ইন্দো-আর্য নরগোষ্ঠীর চেহারার বৈশিষ্ট্য হল দেহের বলিষ্ঠ গড়ন, গৌরবর্ণ, দীর্ঘ আকৃতি, লম্বা মাথা, লম্বা সরু নাক, কটা চোখ। বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যে অল্পবিস্তর এই রকমের চেহারা দেখা যায়। রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দক্ষিণ রাঢ়ি ও বঙ্গজ কায়স্থ এবং গোয়ালাদের শতকরা আট দশ জনের মধ্যে দীর্ঘকায়, দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘনাসা গড়ন চোখে পড়ে। তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় বাঙালী জাতির মধ্যে ইন্দো-আর্য উপাদান যে নেহাত কম তাতে সন্দেহ নেই। ভেড্ডিড ও মোঙ্গোলীয় মিশ্র রক্তে এই উপাদান এত অল্প মাত্রায় মিশেছে যে, তা সহজে ধরা পড়ে না।

এদেশে ইন্দো-আর্যদের আসবার ঠিক পরে পরেই সম্ভবত পারস্য তুর্কিস্থান এলাকা থেকে এদেশে শক জাতির অভিযান শুরু হয়। ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তারা মিশে যায়। এদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল—দেহের মাঝারি গড়ন, চওড়া গোল মাথা, মাথার পেছন দিকটা চ্যাপ্টা খাড়াই, লম্বা নাক, ঈষৎ পীতাভ চোখ। উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এই রকম চেহারার ধরন কমবেশি দেখা যায়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই উপাদান বিরল। নৃতাত্ত্বিকদের কারো কারো মতে, উচ্চবর্ণের বাঙালীদের গোল মাথার মূলে আছে এই শক জাতীয় উপাদান।

বেশিরভাগ বাঙালীরই মাথার গড়ন মাঝারি। রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ি ও বঙ্গজ কায়স্থ এবং বৈদ্যদের মধ্যে যে গোল মাথা দেখা যায়, তাতে গোলত্ব কমের দিকে। কারো কারো মতে, রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ি কায়স্থ এবং অল্প পরিমাণে বৈদ্য, বঙ্গজ কায়স্থ, গোয়াল ও পোদদের মধ্যে ভেড্ডিড ও অ্যালপীয় মিশ্রণ অর্থাৎ, গোল মাথা, সরু নাক ও মাঝারি আকৃতি দেখা যায়। উচ্চবর্ণের মধ্যে ও গোয়ালাদের মধ্যে এর সঙ্গে মিশেছে ইন্দো-আর্যদের দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘনাসা,

গৌরবর্ণ উপাদান। বাঙ্গালীদের মধ্যে আরেকটি আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় : গোল মাথা, ভারী, লম্বা-চওড়া কাঠামো—অনেকটা ‘জনবুল টাইপ’-এর (অ্যাল্পীয়) চেহারা। যাই হোক, গোল মাথা হওয়ার কার্যকারণগুলো আজও যথার্থভাবে সাব্যস্ত হয়নি।

সংক্ষেপে এই হল বাংলাদেশের জনতাত্ত্বিক চেহারা। কিন্তু শেষ কথা বলবার সময় এখনও আসেনি। এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে গেলে সারা ভারতে ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান দরকার। তাছাড়া ভারতবর্ষের জনগঠনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত একদিকে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার নানা দেশ, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নানা দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের জনজীবনের সঙ্গে এই সব দেশের জনগোষ্ঠীর আনাগোনা, দেওয়া-নেওয়ার যে বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার হারানো সূত্রগুলো খুঁজে পাওয়া দরকার। তাছাড়া বাংলাদেশেও এখনও নৃতাত্ত্বিক মাপজোক ও তথ্যের যথেষ্ট অভাব।

তবে সাধারণভাবে আজ এইটুকু বলা যায় : হিম যুগেই এদেশে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের সেই আদিম মানুষদের সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তাদের প্রস্তরীভূত কোন কঙ্কাল আজও পাওয়া যায়নি। তবে নানা দিকের তথ্য-প্রমাণ দেখে মনে হয় এদেশের ভেড়াপ্রতিম আদিবাসীরাই তাদের সাক্ষাৎ বংশধর। ভারতের সেই আদি মানবজাতিই এদেশের মাটিতে বিচিত্র ডালপালা ছড়িয়েছে। পরে তাদের রক্তে বহিরাগত বহু রক্তের ধারা এসে মিলেছে।

বাঙ্গালীর জনপ্রকৃতিতে এ পর্যন্ত যেসব উপাদান পাওয়া গেছে, তাতে বলা যায়— ভেড়িড উপাদানই বাংলার জনগঠনের মূল ও প্রধান উপাদান; পরে কালক্রমে নানা অবস্থায় তাতে কমবেশি মাত্রায় পশ্চিমে ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বে মঙ্গোলীয়, প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশিয় উপাদান এসে মিশেছে।

এই বিচিত্র মেলামেশার ফলে পাঁচমেশালি জাত হয়েও কালক্রমে বাঙালীর একটা নিজস্ব গড়ন দাঁড়িয়ে গেছে। তার ফলে, বেশীর ভাগ বাঙালীর চেহারাই দেখা যায় মাঝারি গোছের— মাথার গড়ন লম্বাও নয় গোলও নয়, নাক লম্বাও নয় চ্যাপ্টাও নয়, মাথায় লম্বাও নয় বেঁটেও নয়। এই মাঝারি গোছের চেহারাকেই বলা হয় যায় মার্কামারা বাঙালীর চেহারা।

বাংলাদেশের বুকে বিভিন্ন জাতির রক্তমিশ্রণের এই ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পেরিয়ে ঐতিহাসিক কালের প্রাচীন বাংলায়ও সমানে বয়ে চলল। সে ধারা আজও থেমে যায়নি। আজও নানান জনের নানান রক্তধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছে।

বাংলার বাইরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা লোকলঙ্কার নিয়ে বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে। তাদের একাংশ হয়তো স্থায়ীভাবে এদেশে থেকে গেছে। এদেশের জনসমুদ্রে কবে কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, তার কোন হিসেব নেই। পুরনো পুঁথির পাতায় শুধু নাম হয়ে তারা বেঁচে আছে। মালব, চোড়, খস, হুণ, কুলিক, কর্ণাট, লাট, যবন, কম্বোজ, খর, দেবল বা শাকদ্বীপী— এদের এদেশে আসবার পেছনে যার যে ইতিহাসই থাক না কেন, এরা

সংখ্যায় এত অল্প এবং ধারা হিসাবে এত ক্ষীণ যে, নরতত্ত্বের দিক থেকে এদের আজ আলাদা করে চেনবার কোনই উপায় নেই।

রাজারাজড়াদের মধ্যে ভিন্ন প্রদেশী রাজকন্যাদের বিয়ে করার চলন ছিল। পুরুষানুক্রমে অনেক সময় এই ধারা বজায় থেকেছে। কেননা রাজবাড়ির বিয়েতে তো আর জন কিম্বা বর্ণের বালাই নেই – রাজবংশ, প্রভুবংশ হলেই হল। এইভাবে ভিন্ন প্রদেশের যে কয়েকজন নারী বাংলাদেশে এসেছে, তারাও বাংলার বিশাল জনসমুদ্রে জলবিন্দুর মত হারিয়ে গেছে।

এ ছাড়াও ভিন্ন প্রদেশ থেকে কয়েকটি রাজবংশ এসে বাংলার কমবেশি অংশে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে রাজত্ব করলেও বাংলার জনপ্রবাহে তারা কোনো ছাপ রেখে যেতে পারেনি। তুর্কি বিজয়ের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে এই রকমের তিন চারটি প্রধান প্রধান রাজবংশের খবর পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে খড়্গ নামে একটি রাজবংশ সমতট অঞ্চলে প্রায় তিন চার পুরুষ ধরে রাজত্ব করেছিল। দশম শতকে কন্মোজ নামে এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুদিন রাজত্ব করেছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে এক বর্মণ রাজবংশ প্রায় পাঁচ-ছ পুরুষ ধরে রাজত্ব করেছে। এরপর কর্ণাট দেশ থেকে এল সেন রাজবংশ। বাংলাদেশে প্রায় তারা দু'শো বছর ধরে রাজত্ব করে এবং সে সময়কার বাংলার সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে, স্মৃতি-শাসনের রূপান্তর ঘটিয়ে সমাজের উচ্চস্তরে এক নতুন সমাজবিন্যাস গড়ে তুলেছিল। দু'শো বছর বাংলায় থেকে তারা একেবারে পুরোদস্তুর বাঙালী বনে গিয়েছিল এবং বাঙালির জনপ্রবাহে তারা নিজেদের নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছিল।

২.৩ সারাংশ (প্রথম অংশ)

রাজমহল পাহাড়ে পাহাড়ি মালদের বাস। বেদেদের মত ছোটখাটো চেহারা গায়ের রং কালো নাক চ্যাটালো। এদের নৃতাত্ত্বিক নাম ভেডিড। এই ভেডিডরাই ভারতের প্রকৃত আদিবাসী। ভারতে বিবর্তনের ধারায় মানুষের আবির্ভাবের জমি তৈরি হচ্ছিল টারশিয়ারি যুগ থেকেই। তার প্রমাণ এদেশে পাওয়া ঐ সময়ের নর বানরের দাঁত ও চোয়ালের হাড়। হিম যুগের পর থেকে এই দেশে আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী মানুষ তাদের পছন্দমত নানান দলে ভিন্ন জায়গায় বাস করত। বাইরের থেকে আসা মানুষের সংস্পর্শে আসার পর তাদের পুরোনো চেহারার পরিবর্তন হয়। ক্রমে বাইরের থেকে আসা মানুষরাও এদেশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

বাঙলার মাটিতে নানা জাতের মেলামেশা। আদি অস্ট্রেলীয়দেরই ভেডিড বলা হয়। দ্রাবিড় বা আর্য আসলে নরগোষ্ঠী নয় ভাষাগোষ্ঠী। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সাথে মিল থাকায় এরা আদি-অস্ট্রেলীয় বলে পরিচিত। মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্থল থেকে ভেডিডদের নরমুণ্ড পাওয়া যায়। ভেডিডদের উপাদান মিশে আছে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ভূমিজ, নমঃশূদ্র, বাউরী, বাগদি, চভালদের মধ্যে। ভারতের বাইরে আরব, আফগানিস্তান, মালয়, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়াতে ভেডিড রক্তের প্রবাহ বর্তমান। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়রা ভেডিডদের বংশধর। পরিবেশের প্রভাবে চেহারার পরিবর্তন ও জীবনের ধরন বদলেছে। বাংলাদেশের লোকেদের একটি ধারা মোঙ্গলপ্রতিম। এদের চোখ

বাদামী রঙের লালচে চোখ। মোঙ্গোলীয় শাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যারোইয়ানদের রূপ দেখা যায় চিনেদের মধ্যে। বাংলার দু-একটি জাতি প্যারোইয়ান। ইন্দো-আর্য দীর্ঘ মুণ্ড জনধারা তিন চার হাজার বছর আগে আরল কাশ্যপ সাগরের তীরে এসেছিল। এদের চেহারার বৈশিষ্ট্য বলিষ্ঠ গড়ন, দীর্ঘ আকৃতি। লম্বা মাথা, লম্বা সরু নাক, কটা চোখ। এরপর পারস্য ও তুর্কি থেকে শকরা আসে। এদের দেহ মাঝারি গড়ন, চওড়া গোল মাথা, যেগুলির সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মিল রয়েছে। এছাড়া মালব, চোড়, ভূণ, কুলিক কর্ণাট প্রভৃতি জাতি এসে তেমন কোনো ছাপ না-রেখেই এদেশের জনসমুদ্রে মিশে গেছে। কর্ণাটের উচ্চবর্ণ মানুষরা কোল-মুন্ডা অ্যালপাইন গোষ্ঠীভুক্ত।

অনুশীলনী-১

নিচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিচের দেওয়া বিবৃতি ঠিক না ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে ঠিক(✓)বা ভুল(X) চিহ্ন দিয়ে

চিহ্নিত করুন।

ক) মালদেবের চেহারা বেদেদের মত ছোটখাটো-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

খ) মালদেবের গায়ের রং ফর্সা-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

গ) মালদেবের নৃতাত্ত্বিক নাম ভেডিডড-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

ঘ) বিবর্তন ধারায় -

☐	☐
--------------------------	--------------------------

ঙ) হিম যুগের পর ভারতে আবহাওয়ার তারতম্য ঘটে-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

চ) বাঙালির বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য একই মাটিতে নানা জাতের মেলামেশা-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

ছ) দ্রাবিড়রা নরগোষ্ঠী-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

জ) আদি অস্ট্রেলীয়দের ছন বলা হয়-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

ঝ) আরবে ভেডিডডদের রক্তের প্রবাহ বর্তমান-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

ঞ) বাংলাদেশের লোকের একটি বড় ধারা ভেডিডড-

☐	☐
--------------------------	--------------------------

২। সঠিক উত্তরটির ডানদিকের ঘরে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) কোন পাহাড়ে মালদের বাস?

দার্জিলিং-

হিমালয়-

ডুয়ার্স-

রাজমহল-

খ) ভেড়িডদের নরমুণ্ড পাওয়া যায়-

হরপ্পার ধ্বংসস্থূপে-

নালন্দার ধ্বংসস্থূপে-

মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্থূপে-

কনৌজের ধ্বংসস্থূপে-

গ) বাংলার প্যারোইয়ান-

নমঃশূদ্র বাউরী-

সাঁওতাল ওরাও-

মুন্ডা ভূমিজ-

কোচ রাজবংশী-

ঘ) ইন্দো-আর্যরা এসে উপস্থিত হয়-

তিন-চার হাজার বছর আগে-

পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে-

দুই এক হাজারবছর আগে-

দুই চার হাজার বছর আগে-

ঙ) পারস্য ও তুর্কি থেকে আসে-

হুণ-

মুন্ডা-

শক-

বাউরী-

চ) ইন্দো- আর্যরা এসেছিল-

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত দিয়ে

উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে

পূর্বদিক থেকে-

পশ্চিম দিক থেকে

ছ) দক্ষিণ ভারতে ভেড়িডদের বংশধর-

দ্রাবিড়রা-

অস্ট্রিকরা-

ভোট চীনরা-

মঙ্গোলিয়া-

জ) যে মঙ্গোলীয় শাখা বাংলাদেশের জনপ্রকৃতিতে বেশি ছাপ রেখেছে, তা হল-

প্যারোইয়ান-

ন্যারাইইয়ান-

সায়াইয়ান-

ফিলিপাইন-

ঝ) দু'শ বছর আগেও মালেরা ছিল-

অভিন্ন-

আংশিক ভিন্ন-

ভিন্ন-

মিশ্র-

ঞ) রাজরাজাদের মধ্যে চলন ছিল ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে

আক্রমণ করা-

রাজকন্যাদের বিয়ে করা-

সংস্কৃতির কথা বলা-

শোষণ করা-

৩। বিপরীত শব্দ লিখুন:

ক) কালো

খ) প্রাচীন

গ) মিল

ঘ) খাঁটি

ঙ) উচ্চবর্ণ

চ) লম্বা

ছ) পছন্দ

জ) বাস্তব

ঝ) হিম

ঞ) সভ্যতা

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) রাজমহল পাহাড়ে _____ মালেকের বাস।

খ) আদি অস্ট্রেলীয়দের বলা হয় _____।

গ) চওড়া গোল মাথা উচ্চবর্ণ _____ সাথে মিল রয়েছে।

ঘ) প্যারোইয়ান দেখা যায় _____ মধ্যে।

ঙ) _____ লোকেদের একটি ধারা মোঙ্গোলপ্রতিম।

চ) _____ উচ্চবর্ণ মানুষরা গোলমুণ্ডা অ্যালপাইন।

ছ) _____ যুগের পর থেকে আবহাওয়ার তারতম্য ঘটে।

জ) _____ ভারতের প্রকৃত আদিবাসী।

ঝ) _____ দের মত ছোটখাটো চেহারা।

ঞ) বাংলাদেশের মাটির গুণ আর সেই মাটিতে নানা জাতের _____।

২.৪ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

কর্ণাটদেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা তো জন হিসেবে মোটামুটি গোলমুন্ড উন্নতনাসা আলপাইন গোষ্ঠীভুক্ত, উচ্চবর্ণের বাঙালীরাও তাই। কাজেই এই রাজবংশ বাংলাদেশে কোন নতুন রক্তধারা বয়ে আনতে পারেনি। আনলেও সে ধারা এত ক্ষীণ ও শীর্ণ যে, আজ তা ধরা পড়বার নয়।

তুর্কি বিজয়ের পরও বাংলাদেশে এই ধরনের শীর্ণ ও ক্ষীণ রক্তধারার কিছু কিছু ছোঁয়াচ লেগেছে। ভারতের বাইরে থেকে যেটুকু এসেছে তার দু-চারটে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিছু কিছু আরবী মুসলমান পরিবার বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশে এসে বসবাস করেছে, নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং বাংলার অন্যান্য জেলাতেও কিছু কিছু তাদের দেখা পাওয়া যায়। শত শত বছর ধরে একত্রে বসবাস করার ফলে বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে তারা এক হয়ে গেছে।

বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ-ছ জন হাবসী সুলতান বহুদিন ধরে রাজত্ব করেছে। তাছাড়া হাবসী প্রহরী রাখার চলনও এদেশে কিছু কিছু ছিল। এরাও বাঙালীর রক্তেই নিজেদের রক্তে মিশিয়েছে। তাই এমন কি বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উচ্চস্তরেও কখনও কখনও কৃষবর্ণ, প্রশস্তনাসা, উর্ণাবৎ রক্ষ কেশ, পুরু উল্টানো ঠোঁট দেখতে পাওয়া যায়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মগ জলদস্যুদের উৎপাতে বাংলার সমুদ্রতীরের জেলাগুলি অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাদের মারফৎ কিছু কিছু মগ রক্তও বাঙালীর রক্তপ্রবাহে সঞ্চারিত হয়েছে।

এমনই অবিচ্ছিন্ন ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে বিভিন্ন জন মিলেমিশে একাকার হয়ে কালক্রমে বাঙালী জাতির সৃষ্টি করেছে।

ভাষা

বাজারে পান কিনতে গেলে আজও আমরা এক কুড়ি, দু' কুড়ি, তিন কুড়ি, এক পণ (চার কুড়িতে অর্থাৎ ৮০ টায় এক পণ) হিসেবে দল করি। 'কুড়ি' শব্দটি এবং গণনা করবার এই পদ্ধতিটি আমরা কোথা থেকে পেলাম? পেয়েছি অস্ট্রিক-ভাষাভাষীদের কাছ থেকে। মানুষের হাত ও পায়ের কুড়ি আঙ্গুলের সঙ্গে তাদের কুড়ি শব্দটির সম্বন্ধ। কুড়ি পর্যন্তই ছিল তাদের সংখ্যা-গণনার দৌড় এবং কুড়িতেই তাদের এক মান। 'পণ' এবং 'গণ্ডা', 'গুঁড়ি' বা 'গুঁড়া', 'গুঁটি' ('গোণ্ড' বা 'গণ্ড' থেকে)–এ সমস্তই অস্ট্রিক ভাষার দান।

আসাম, মালয়, তালৈঙ, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রকৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যেসব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ ও খমের-গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যেসব ভাষায় রচিত সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই বিরাট ভাষাপরিবারের নাম 'অস্ট্রিক'। এইসব অধিবাসীরা জন হিসেবে একই গোষ্ঠীর নয়। ঐসব ভূখণ্ডে আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল। নানা জন-বিবর্তনের ভেতর দিয়েও সেই ভাষাপ্রবাহ আজও চলে আসছে। এক সময় এই ভাষা মধ্য ভারত থেকে আরম্ভ করে সাঁওতাল ভূমি, আসাম, নিম্নব্রহ্ম, মালয়, আনামম নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল। এই ভূখণ্ডের দক্ষিণেই দ্রাবিড়ভাষী জনপদ এবং তার ফলে জোরালো দ্রাবিড় ভাষা কোল ভাষার ভূখণ্ডে কোথাও কোথাও ঢুকে পড়েছে। অথচ সবাই জানে, দ্রাবিড় ভাষার

সঙ্গে কোল ভাষার কোন সম্বন্ধে নেই। আবার অন্যদিকে হিমালয়ের ঠিক নিচে এমন সব বুলি এখনও প্রচলিত, যেগুলি ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা হলেও, তাদের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা মুণ্ডা ভাষারই বিশেষ লক্ষণ। অস্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি উত্তর ভারতের অনেক জায়গাতেই ছিল। পরের যুগে দ্রাবিড় ও আর্য ভাষা পশ্চিম দিকে এবং ভোট-বর্মী ভাষা পূর্বদিকে অস্ট্রিক ভাষাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে অধিকাংশ জায়গাতেই তাকে গ্রাস করে একেবারে হজম করে ফেলেছে। যে জায়গায় পারেনি বা নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে সম্ভব হয়নি সেখানেই কোন রকমে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত সামান্য কিছু লোকের বুলির মধ্যে টিকে থেকেছে।

সারা উত্তর ও পূর্ব ভারতে, কাশ্মীরে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, বিহারে, উড়িষ্যায়, বাংলায়, আসামে, হিন্দুস্থানে, রাজপুতনায়, পাঞ্জাবে, সীমান্ত প্রদেশ, বিশেষভাবে গোটা গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে আর্য ভাষার প্রবল প্রতাপ। এই আর্যভাষাই আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক। এই আর্য ভাষার প্রধান রূপ ‘সংস্কৃত’ প্রাকৃতজনের মধ্যে ‘প্রাকৃত’। প্রাকৃতির অপভ্রংশ থেকে বর্তমান উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি। বাংলা ভাষা তার মধ্যে অন্যতম। প্রাকৃত-সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও নিছক অস্ট্রিক রূপে, কোথাও সংস্কৃত প্রাকৃতির ছদ্মবেশে, বিস্তৃত প্রাকৃত-সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষায় এমন অসংখ্য শব্দ ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এমন ব্যাকরন ও পদরচনারীতি আছে, যা মূলে অস্ট্রিক ভাষা থেকে গৃহীত। এ থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, আর্যভাষাভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এবং অস্ট্রিকভাষী লোকের বিস্তৃতি আগে দেখানো হয়েছে, তার চেয়েও তাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক, আরও গভীর ছিল। যেসব শব্দের সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রায় অবিচ্ছেদ্য, তার কয়েকটি নমুনা নিচে তুলে দেওয়া হল।

খাঁ খাঁ, খাঁখাঁর, বাঁখারি, বাদুড়, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো), জাং (জজ্যা), ঠেঙ্গ, ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোচ্চগা, কলি (চুন), ছোট, পেট, খোস, ঝোড় বা ঝাড়, ঝোপ, ডোম, চোং, চোঙ্গা, মেড়া, বোয়াল, করাত, দা বা দাও, পগার, গড, বরজ, লাউ, লেবু-লেমু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত বাংলা শব্দ মূলত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। পুণ্ড্র-পৌণ্ড্র, তাম্রলিপি- তাম্রলিপি- দামলিপি এবং বোধহয় গঙ্গা বা বঙ্গ নাম দুটিও একই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর নাম দুটিও কোল কর-দাক ও দাম-দাক থেকেই গৃহীত। কোল দা বা দাক অর্থে জল এবং দা বা দাক থেকেই সংস্কৃত উদক। মুণ্ডা ‘ঢেঙ্কি’ বাংলায় ‘ঢেঁকি’, মুণ্ডা ‘মোটো’ বাংলায় ‘মোটা’। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষায় নদনদী, পাহাড়-পর্বত, গ্রাম-জনপদের যেসব নামকরণ করেছিল, আজও বাংলা বুলিতে তার কিছু কিছু রেশ আছে। যেমন শিয়ালদহ শিয়াল-দা, ঝিনাইদহ বা ঝিনাই-দা (দহ বলতে বোঝায় জলভরা গর্ত, নদীগর্ভের গর্ত)। অষ্টম শতকের ‘আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প’ বইতে কর্মরাসাখ্য (ইউয়ান-চোয়াঙের কামলক্ক, চিনা গ্রন্থের লংকীয়া, লংকীয়াসু), নাড়িকেল (নারিকেল), বারুসক (এখনকার বারোস), নগ্ন (এখনকার নিকোবর), বলি এবং যবদ্বীপের ‘র’-কারবহুল অস্পষ্ট ও রুঢ় ভাষার উল্লেখ আছে। এই শ্রুতিকটু অসুর ভাষাভাষীদেরই ঋগ্বেদে সম্ভবত ‘অসুর’ বলা হয়েছে। ‘আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে’ বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকদের অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের লোকদের ‘অসুর’ ভাষাভাষী বলা হয়েছে। কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির

নাম এখনও ‘অসুর’ বুলি। মধ্য ভারতের পূর্বখণ্ডে যারা অসুর বুলিতে কথা বলত, তারা আদি-অস্ট্রেলীয় পরিবারের লোক তাতে সন্দেহ নেই। গৌড়-পুণ্ড্রের আদিমতর স্তরে যে আদি অস্ট্রেলীয়দের বিস্তৃতি ছিল, ভাষা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

বাংলাদেশে আজও লোকে কুকুর ডাকার সময় চু চু বা তু তু বলে। কুকুরের অস্ট্রিক প্রতিশব্দ থেকে কথাটা বাংলায় এসেছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন প্রচারক মহাবীর যখন রাঢ় ও সুক্ষে (দক্ষিণ রাঢ়) এসেছিলেন তখন সেখানকার লোকেরা ‘ছু’ ‘ছু’ বলে চিৎকার করে তাঁকে কামড়াবার জন্যে কুকুর লেলিয়ে দেয়। এই ঘটনা থেকে আঁচ করা যায় খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাঢ়ে-সুক্ষে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার প্রচলন ছিল। এই দুই জায়গায় আজও অস্ট্রিক ভাষাভাষী পরিবারভুক্ত সাঁওতাল ও কোলদের বাস দেখতে পাওয়া যায়।

অস্ট্রিক ভাষার মতোই দ্রাবিড় ভাষা থেকেও আর্যভাষায় সংস্কৃতে-প্রাকৃতে-অপভ্রংশে অনেক শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণরীতি ইত্যাদি ঢুকে পড়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, আর্যভাষাভাষী লোকেরা দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে এসেছিল। প্রাচীন ও বর্তমান বাংলার অসংখ্য জায়গার নাম, নামের উপাস্ত ‘ড়া’ (বগুড়া, হাওড়া, রিষড়া, বাঁকুড়া), ‘গুড়ি’ (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি), জুলি (নয়নজুলি), জোল (নাডাজোল), জুড় (ডোমজুড়), ভিটা, কুণ্ড প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকেই এসেছে।

মোস্টোলীয় ভোট-ব্রক্ষ ভাষার প্রভাব বাংলায় খুবই ক্ষীণ ও শীর্ণ। অবশ্য উত্তরতম ও পূর্বতম প্রান্তের লোকদের মধ্যে চলতি বুলিতে কিছু কিছু ভোট-ব্রক্ষ শব্দের খোঁজ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যে নদীকে ত্রিশ্রোতা বলা হয়, তা ভোট-ব্রক্ষ দিস্তাং বা তিস্তা শব্দ থেকেই এসেছে।

বাস্তব সভ্যতা

ভেতো বাঙালি বলে বাঙ্গালীদের একটা দুর্নাম আছে। এই দুর্নাম এর পেছনে রয়েছে এক গৌরবময় সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। সে সভ্যতা হল কৃষি সভ্যতা। অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলীয় লোকেরাই এদেশে প্রথম চাষাবাদের প্রচলন করে। কাঠের লাঙ্গলে তারা প্রধানত ধানের চাষ করত। ধানই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। আর লাঙ্গল শব্দটা ও তাদেরই ভাষা থেকে নেওয়া। এ থেকে বোঝা যায় আর্য ভাষীরা চাষের কাজ জানতো না। লাঙ্গল এর সাহায্যে চাষ করবার কায়দাটা তারা অস্ট্রিক ভাষীদের কাছ থেকেই শেখে। অস্ট্রিক ভাষী লোকেরা ভারতের যেখানে যেখানে ছড়িয়ে ছিল, সব জায়গাতেই ধান চাষে প্রচলন করে। নদ-নদী আর বৃষ্টির জলে ধানের ফসল বেশি হয় বলেই বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা আর দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতল ভূমিতে ধানের চাষ এত ব্যাপক।

ভারতবর্ষে যব আর গমের চাষের প্রচলন করে দ্রাবিড় ভাষাই দীর্ঘ মুণ্ড লোকেরা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু হয়। ক্রমে তা বিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যব আর গম ধানের মতো ততো বারি নির্ভর নয়; তাই উত্তর ভারতে যব আর গমের চাষ এত বেশি। উত্তর ভারতের লোকদের যেমন সাধারণভাবে রুটি, বাংলা আসাম উড়িষ্যাও দক্ষিণ

ভারতের সমুদ্রশায়ী সমতল ভূমির লোকদের তেমনি ভাতই প্রধান খাদ্য। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা আর দক্ষিণ- ভারতের সর্বত্র গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, লোকে সাধারণত রান্নার কাজে সরষে, নারকেল অথবা তিল তেল ব্যবহার করে। সেলাই-না-করা ধুতি-চাদর, উড়ুনি এবং গোড়ালি-খোলা চটি এইসব অঞ্চলের লোকে পরে থাকে। কিন্তু বিহারের প্রান্ত থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ভূখণ্ডের লোকে ঘি, সেলাই-করা জামা কাপড়, গোড়ালি-বাধা চটি ব্যবহার করে থাকে। এ থেকে শুধু জলবায়ু নয়, জনপার্থক্যের ইঙ্গিত ও বোঝা যায়।

ধান ছাড়া অস্ট্রিক ভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান, নারকেল, জাম্বুরা (বাতাবি নেবু), কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, ডালিম ইত্যাদিরও চাষ করত। এই নামগুলোও মূলত অস্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে। চাষবাস জানলেও গো-পালন তারা জানত বলে মনে হয় না। অস্ট্রিকভাষী লোকদের মধ্যে এখনও গো-পালন কম প্রচলিত। তুলোর কাপড়ের ব্যবহার অস্ট্রিক ভাষীদেরই দান। কর্পাস (কার্পাস) শব্দটি মূলত অস্ট্রিক। পট (পটু, পাট), কর্পট (পটুবস্ত্র) এ দুটি শব্দও মূলত অস্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে। মেড়া বা ভেড়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। 'কম্বল' কথাটা মূলত অস্ট্রিক।

২.৫ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

কুড়ি শব্দটি আমরা পেয়েছি অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের কাছ থেকে। এই কুড়ি মানুষের হাত ও পায়ের কুড়ি আঙ্গুলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়াও পণ, গন্ডা, গুড়ি, গুটি এগুলিও অস্ট্রিক ভাষার দান। আসাম, মালয়, কোল, সাঁওতাল, নিকোবরীরা যে ভাষায় কথা বলে তা পরিবারভুক্ত। এই ভাষাপরিবারের নাম অস্ট্রিক। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষা এগিয়ে চলে। দক্ষিণে দ্রাবিড় ভাষী জনপদ কোল ভাষার ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে যদিও দ্রাবিড় ও কোল পৃথক ভাষা। হিমালয়ের নিচের ভাষা ভোটবর্মী হলেও মুন্ডা ভাষার লক্ষণ বিদ্যমান।

আর্য ভাষা আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। আর্য ভাষার প্রধান রূপ সংস্কৃত প্রাকৃত জনের মধ্যে হয়েছে প্রাকৃত। প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। বাংলার ব্যাকরণ ও পদ রচনারীতির মূলে অস্ট্রিক ভাষা আছে। পুন্ড পৌন্ড, তাম্রলিঙ, দামলিপি, গঙ্গা, বঙ্গ অস্ট্রিক ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর শব্দ কোল 'কব ডাক' ও 'দম-দাক' থেকে গৃহীত। মুন্ডা 'ঢেঙ্কি' বাংলায় 'ঢেঁকি'। মুন্ডা 'মোটো' বাংলায় 'মোট'। অস্ট্রিকরা 'দহ' বলতে জলভরা গর্ত, নদীগর্ভের গর্ত বোঝায়।

'আর্যমঞ্জুষ্রীমূলকল্পে' উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম লোকদের অসুর ভাষাভাষী বলা হয়েছে। কোলমুন্ডা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলি হল 'অসুর' বুলি। বাংলাদেশের লোকেরা কুকুরকে 'চু-চু' বা 'তু-তু' বলে ডাকে। কুকুরের অস্ট্রিক প্রতিশব্দ থেকে কথাটা বাংলায় এসেছে। আর্য ভাষাভাষী লোকেরা দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের সংস্পর্শে এসেছিল। প্রাচীন ও বর্তমান বাংলায় অসংখ্য জায়গার নাম, নামের উপাস্ত ডা, গুড়ি, জুলি, প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে।

কৃষি সভ্যতায় বাঙালিকে ভেতো বাঙালি বলা হয়। অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলিয় লোকেরাই প্রথম চাষাবাদের প্রচলন করে। ধান ছিল প্রধান খাদ্য। লাঙল শব্দটাও তাদেরই ভাষা থেকে গৃহীত।

ভারতে যব ও গমের প্রচলন দ্রাবিড় ভাষাভাষী দীর্ঘ মুণ্ড লোকেরা করে। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে রান্নার কাজে তিল তেল, নারকেল, সরষে ব্যবহার করে। অস্ট্রিকরা গোপালন জানত না। তুলোর কাপড়ের ব্যবহার অস্ট্রিকদের দান। কার্পাস অস্ট্রিক শব্দ।

অনুশীলনী -২

নিচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন

১। নিচের দেওয়া বিবৃতি ঠিক কি না ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে ঠিক(✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
ক) কুড়ি শব্দটি পাই দ্রাবিড়দের কাছ থেকে-	☐	☐
খ) গন্ডা অস্ট্রিক ভাষার দান	☐	☐
গ) সাঁওতালরা যে ভাষায় কথা বলে তা পরিবারভুক্ত নয়-	☐	☐
ঘ) হিমালয়ের নিচের ভাষা ভোটকী-	☐	☐
ঙ) আর্য ভাষার প্রধান রূপ হিন্দি-	☐	☐
চ) গোলমুন্ডা গোষ্ঠীর অন্যতম বুলি অসুর বুলি-	☐	☐
ছ) ঢেঙ্কি শব্দের অর্থ ঢাক-	☐	☐
জ) অস্ট্রিক রা সারা ভারতে ধান চাষের প্রচলন করে-	☐	☐
ঝ) ষোড়শ- সপ্তদশ শতকে মগ জলদস্যুদের আক্রমণ হয়-	☐	☐
ঞ) মগ রক্তও বাঙালির রক্তপ্রবাহে মিশেছে-	☐	☐

২। সঠিক উত্তরটির ডানদিকের ঘরে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) অস্ট্রিকরা দহ বলতে বোঝায়

ধানভরা গর্ত

জলভরা গর্ত

সমুদ্র ভরা গর্ত

বালি ভরা গর্ত

খ) কৃষি সভ্যতার উত্তরাধিকারী বাঙালিকে বলা হয়-

ধানী বাঙালি

ভেতো বাঙালি

মেঠো বাঙালি

সুখী বাঙালি

গ) অস্ট্রিক রা জানত না-

ধান চাষ

গম চাষ

তুলো চাষ

গোপালন

ঘ) দ্রাবিড়রা পত্তন করে-

গ্রাম সভ্যতা

নগর সভ্যতা

গ্রাম ও নগর সভ্যতা

নদীমাতৃক সভ্যতা

ঙ) অস্ট্রিকরা পুজো করত-

সেওড়া বটগাছ

আম জাম গাছ

কাঁঠাল বটগাছ

পেয়ারা গাছ

চ) প্রথম চাষাবাদের প্রচলন করে-

বর্তমান অস্ট্রেলিয়

আদি অস্ট্রেলিয়

দ্রাবিড়

মোগোলীয়রা

ছ) কব্বল কথাটি

অস্ট্রিক

দ্রাবিড়

ভোটবর্মী

তুর্কী

জ) সমুদ্রশায়ী সমতল ভূমির লোকদের প্রধান খাদ্য-

ভাত

রুটি

নান

খিচুড়ি

ঝা) কাঠের লাঙল দিয়ে মূলত চাষ হত-

গম

যব

ধান

পেঁয়াজ

ঞ) ভিটা শব্দটি এসেছে-

অস্ট্রিক থেকে

দ্রাবিড় থেকে

মোগোল থেকে

ভোটবর্মী থেকে

২.৬ সারসংক্ষেপ:

কালো নাক, চ্যাটালো, ছোটখাটো চেহারার যে জনজাতির মানুষ রাজমহল পাহাড়ে বসবাস করত তারাই আসলে ভারতের প্রকৃত আদিবাসী। এদের নৃতাত্ত্বিক নাম 'ভেডিড'। বিবর্তনের ধারায় 'টারশিয়ারি যুগ' অতিক্রম করে হিম যুগের পরবর্তী সময়ে আবহাওয়া'র তারতম্য অনুযায়ী মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক স্থানে বসবাস শুরু করল। বাইরের মানুষের সংমিশ্রণে দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এদের মধ্যে। ভেডিডদের রক্ত প্রবাহ, উপাদান মিশে আছে বঙ্গের জনজাতি'র মধ্যে ও ভারতের বাইরে কয়েকটি দেশে। মোগোলীয় শাখার উল্লেখযোগ্য রূপ হল প্যারোইয়ান। এই শাখার ধারা বাংলাদেশ, এপার বাংলা ও চীনে প্রবাহিত। পারস্য ও তুর্কি থেকে শকরা এদেশে আসে, যাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাদৃশ্য দেখা যায়। এছাড়া, কর্ণাটের উচ্চবর্ণ মানুষরা কোল-মুন্ডা অ্যালপাইন গোষ্ঠীভুক্ত।

হাত এবং পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা সমষ্টি 'কুড়ি'। গণনা'র সুবিধার জন্য এই 'কুড়ি' শব্দটি অস্ট্রিকদেরই দান। অস্ট্রিক একটি ভাষা পরিবার। বাংলার কয়েকটি জনজাতি এই ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। মুন্ডা ও ভোট বর্মী ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায় হিমালয় সংলগ্ন মানুষের মুখের ভাষায়। বাংলা ভাষার জন্ম প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে, যার ব্যাকরণ ও পদ রচনা রীতির মূলেই অস্ট্রিক ভাষা। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম মানুষদের অসুর ভাষাভাষী বলা হয়েছে এবং এই অসুর বুলিই কোল-মুন্ডা গোষ্ঠীর প্রধান বুলি হিসেবে প্রতিপাদ্য। এছাড়া, আর্য ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের মিশ্রণের প্রমাণ স্বরূপ- নামের উপাস্ত ডা, গুডি, জুলি প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ধান চাষের প্রচলন অস্ট্রিকরা করলেও গম চাষ এবং যব চাষের প্রচলন কিন্তু দ্রাবিড়দেরই দান।

অনুশীলনী:৩

নিচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন

১। সাধু শব্দ থেকে চলিত শব্দের রূপান্তরিত করুন।

ক) বাহির

খ) করিয়াছে

গ) আসিতেছে

ঘ) তাহাদিগের

ঙ) করিয়া

চ) সহিত

ছ) হইবে

জ) ধরিয়া

ঝ) মিশিয়াছে

ঞ) বুঝাইত

২। সমার্থক শব্দ লিখুন।

ক) কালো

11

10

10



11

11

11

11/11/2019

২.৮ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী-১

১।

- (ক) ঠিক
- (খ) ভুল
- (গ) ঠিক
- (ঘ)ভুল
- (ঙ) ঠিক
- (চ) ঠিক
- (ছ) ভুল
- (জ) ভুল
- (ঝ) ঠিক
- (ঞ) ঠিক

২।

- (ক) রাজমহল
- (খ) মহেঞ্জোদারর ধ্বংস স্তূপে
- (গ) কোচ-রাজবংশী
- (ঘ) তিন-চার হাজার বছর আগে

(ঙ) শক

- (চ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে
- (ছ) দ্রাবিড়
- (জ) প্যারোইয়ান

(ঝ) অভিন্ন

(ঞ) রাজকন্যাদের বিয়ে করা

৩।

- (ক) সাদা
- (খ) আধুনিক
- (গ) অমিল
- (ঘ) ভেজাল

(ঙ) নিম্নবর্ণ

- (চ) খাটো
- (ছ) অপছন্দ
- (জ) অবাস্তব

(ঝ) উষ্ণ

(ঞ) অসভ্যতা

৪।

- (ক) পাহাড়ী জাত
- (খ) ভেড়িড

(গ) বাঙালী হিন্দুদের

(ঘ) কোচ-রাজবংশীদের

(ঙ) বাংলাদেশের

(চ) বাঙালী

(ছ) হিম
(জ) ভেড়িড

(ঝ) বেদেদের
(ঞ) মেলামেশা

অনুশীলনী-২

১।

(ক) ভুল
(খ) ভুল
(গ) ভুল
(ঘ) ঠিক

(ঙ) ভুল
(চ) ভুল
(ছ) ভুল
(জ) ঠিক

(ঝ) ঠিক
(ঞ) ঠিক

২।

(ক) জল ভরা গর্ত
(খ) ভেতো বাঙালী
(গ) গো-পালন
(ঘ) নগর সভ্যতা

(ঙ) সেওড়া বটগাছকে
(চ) আদি-অস্ট্রেলীয়
(ছ) অস্ট্রিক
(জ) ভাত

(ঝ) ধান
(ঞ) দ্রাবিড়

অনুশীলনী-৩

১।

(ক) বাইরে
(খ) করেছে
(গ) আসছে
(ঘ) তাদের

(ঙ) করে
(চ) সাথে
(ছ) হবে
(জ) ধরে

(ঝ) মিশেছে
(ঞ) বোঝাত

২।

(ক) কৃষ্ণ
(খ) দন্ত
(গ) শীর্ণ
(ঘ) দীর্ঘ

(ঙ) ছিদ্র
(চ) চক্ষু
(ছ) স্থূল
(জ) বৃক্ষ

(ঝ) জন্ম
(ঞ) মস্তক

৩।

(ক) দেশি
(খ) দেশি

(গ) বিদেশি
(ঘ) দেশি

(ঙ) বিদেশি
(চ) দেশি

(ছ) বিদেশি

(জ) দেশি

(ঝ) দেশি

(ঞ) দেশি



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

একক: ৩ □ জীবনী সাহিত্য:

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর(সংস্কৃত কলেজ পর্ব-৪) – ইন্দ্র মিত্র

গঠন

- ২.০ উদ্দেশ্য
- ২.১ প্রস্তাবনা
- ২.২ মূল পাঠ (প্রথম অংশ)
- ২.৩ সারাংশ (প্রথম অংশ)
- ২.৪ মূল পাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
- ২.৫ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
- ২.৬ সারসংক্ষেপ
- ২.৭ নির্বাচিত পাঠ্য
- ২.৮ উত্তর সংকেত

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের মাধ্যমে আপনি মূলত জানতে পারবেন-

- জীবনী সাহিত্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধারণা।
- পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় এক প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর জীবনে বড় হওয়া, লেখাপড়ার প্রতিকূল পরিবেশ, ও তা উত্তরণ, দয়ালু মানবিকতার হাতে খড়ি এবং ছাত্রাবস্থায় নানাবিধ প্রতিযোগিতার একটি সুস্পষ্ট চিত্র।
- গদ্য লেখার শৈলী সম্পর্কে অবগত হবেন।

২.১ প্রস্তাবনা

বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয় আজও এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ঊনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যের রূপকার। সংস্কৃত কলেজে ১৮২৯ সালে বিদ্যাসাগর মাত্র ন-বছর বয়সে ভর্তি হন। দীর্ঘ বারো বছর পাঁচ মাস দারিদ্রতা সত্ত্বেও অত্যন্ত মেধার সঙ্গে লেখাপড়া করেন ন্যায়, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি শ্রেণীতে। সংস্কৃত শ্লোক, গদ্য, পদ্য লেখেন নানান বিষয়ে। এই একগুঁয়ে, ঘাড়কেঁদো বালক মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তীতে প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। সংস্কৃতের পাশাপাশি ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তিনি অনন্ত পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি রচনা করেছেন যুগান্তকারী

শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয়-সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ ইত্যাদি। সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু রচনা। নারীমুক্তির আন্দোলনে (স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও বিধবা বিবাহ) তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। জীবনী সাহিত্যে করুণাসাগর বিদ্যাসাগর গ্রন্থটি বিশেষ সম্পদ। এই করুণাসাগর বিদ্যাসাগর গ্রন্থের ‘সংস্কৃত কলেজ পর্ব-৪’ আসলে এই মহৎ জীবনীপ্রদীপ জ্বালানোর সলতে পাকানোর পর্ব। এই পর্বটি অনুসরণে নিচের অংশটি দেওয়া হল।

২.২ মূল পাঠ (প্রথম অংশ)

১৮২৯ সালের ১-জুন ঈশ্বর ভর্তি হল সংস্কৃত কলেজে। তখন ঈশ্বরের বয়স ন-বছর।

দিনের পর দিন বেলা নটার সময় ঈশ্বর বড়বাজারের বাসা থেকে বাবার সঙ্গে পটলডাঙ্গার কলেজে গেছে। ছুটির পর বেলা চারটের সময় আবার বাবা ঈশ্বরকে কলেজ থেকে বাসায় নিয়ে এসেছেন।

কিছুদিন পর বাবা বুঝলেন, এখন ঈশ্বর একা একা বাসা থেকে কলেজে যাওয়া আসা করতে পারবে। তাই হল। একা একা ঈশ্বর কলেজে যায়। ছাতা মাথায় দিয়ে একা একা একটি ছোটখাটো মানুষ কলেজে যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হতো যেন একটি ছাতাই আপনা-আপনি হেঁটে যাচ্ছে, যেন ছাতার তলায় মানুষজন কেউ নেই।

ঈশ্বর দেখতে ছোটখাটো। কিন্তু মাথাটি দেখতে সেই তুলনায় বেশ বড়ো-সড়ো। কলেজের ছেলেরা তাই ঈশ্বরকে ঠাট্টা করে। বলে-যশুরে কৈ, কসুরে জৈ। ঈশ্বর রেগে যায়। ঈশ্বর যত বেশি রাগে, ছেলেরা তত বেশী পিছনে লাগে। প্রত্যেকদিন রাতে বাবার কাছে পড়া দিতে হয়। কণামাত্র এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষা নেই।

লেখাপড়া ছাড়াও ঈশ্বরের অটেল কাজ। সকালবেলা গঙ্গান্নান সেরে আসবার পথে বাজার করে আসতে হয়। মশলা বাটা আছে, মাছ-তরকারি কোটা আছে তারপর। রান্নার ভারও একা ঈশ্বরের হাতে। চার-পাঁচজনের রান্না। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ঈশ্বর খেতে বসে। ফেলে ছড়িয়ে খাওয়া বারণ, একটি ভাত পাতের পাশে থাকলে ঠাকুরদাসের কাছে রেহাই নেই। খাওয়ার পর ঈশ্বর সকলের থালা-বাসন মাজে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে। তারপর কলেজে যায়।

ঈশ্বরেরা বড়ো গরীব। রোজ দু-বেলা ভাত জোটে না। দু-বেলা যদি বা জোটে, সব সময় পেট ভরে খাবার মতো জোটে না। অনেক সময় শুধু লবণ দিয়ে ভাত খেতে হয়। যখন মাছ-তরকারি জোটে, তখনও ঘতা করে মাছ-তরকারি খাবার উপায় নেই। মাছ-তরকারির ঝোল হয়। এবেলা ভাত আর শুধু ঝোল চলল। আর একবেলা ভাত আর তরকারি। মাছটুকু রইল পরদিনের জন্য। সেদিন ওই মাছ দিয়ে অম্বল রাঁধা হল। আর ভাত। রান্নাঘরটা অন্ধকার। একফোঁটা রোদ পড়ে না সেখানে। তার উপর রান্নাঘরের পাশে একটা নরককুণ্ড। মলমূত্র আর কৃমিকীটে ভর্তি।

দুর্গন্ধ তো আছেই, তার চেয়েও বেশী ব্যাপার আছে একটা। খাবার সময় ঈশ্বরকে এক ঘটি জল নিয়ে বসতে হয়। তা না হলে ভাত খাওয়ার উপায় নেই। দলে দলে কৃমি ঈশ্বরের থালার দিকে এগিয়ে আসে। ঘটি থেকে জল ঢেলে ঈশ্বর কৃমির দলকে ভাসিয়ে দেয়, সরিয়ে দেয়। রান্নাঘরে আরশোলার ভারি উৎপাত।

একদিন খেতে বসে ঈশ্বর দেখল, তরকারির মধ্যে একটা আরশোলা। না, ঈশ্বর সে কথা তখন কাউকে বলেনি: যদি বলত, নিশ্চয়ই আর সকলের খাওয়া ভঙুল হয়ে যেত। কিংবা, যদি আরশোলাটাকে পাতের পাশে ফেলে দিত, নির্ঘাত কারো চোখে পড়ত। ফল একই হত, আর সকলের খাওয়া পণ্ড হত। আর কারো যাতে অসুবিধা না হয়, আর কেউ যাতে কিছুই টের না পায়, এমনভাবে ঈশ্বর তরকারির সঙ্গে আরশোলাটাকেও খেয়ে ফেলল।

ঈশ্বর ভারি একগুঁয়ে। যা বলা হবে, ঠিক তার উল্টোটি করে বসে থাকবে। ঠাকুরদাসও ছেলেকে চেনেন। কাজ হাসিল করার জন্য তিনিও যেমনটি করাতে চাইতেন ঠিক তার উল্টোটি করতে বলতেন ঈশ্বরকে। ঠাকুরদাস বললেন—ঈশ্বর, আজ একখানা খুব পরিষ্কার কাপড় পরে যাও। অর্থাৎ ঠাকুরদাসের ইচ্ছা, ঈশ্বর আজ ময়লা কাপড় পরে যায়। সেই রকমই হত। ঈশ্বর ময়লা কাপড় পরে যেত। মনে মনে ঠাকুরদাস যা চেয়েছেন, অনেক সময় তাই হয়েছে।

কিন্তু সব সময় হয়নি। এক একদিন ঈশ্বর ধরে ফেলেছে। হয়তো একটা কাজ আধাআধি করে ঈশ্বর বুঝতে পেরেছে যে কাজটা নিজের ইচ্ছায় হচ্ছে না, বাবার ইচ্ছায়ই হচ্ছে। হয়তো বাবা বলেছেন, ‘ঈশ্বর, আজ তোমার স্নান করা হবে না।’ ঈশ্বর তাড়াতাড়ি গায়ে তেল মেখে ফেলেছে। তারপর বুঝতে পেরেছে, বাবার ইচ্ছা আজ সে স্নান করে। সঙ্গে সঙ্গে বেকে বসেছে। না, আজ আর কিছুতেই স্নান নয়। ঠাকুরদাস তখন ঈশ্বরকে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই ঈশ্বর তবু ডুব দিচ্ছে না; ঠাকুরদাস জোর করে ঈশ্বরকে স্নান করিয়েছেন। বিরক্ত হয়ে বলেছেন—এঁড়ে বাছুরই বটে। বাবা ঠাট্টা করে ঋষিভুল্য ঈশ্বরকে একথা বলেছিলেন; কিন্তু তাঁর ঠাট্টাও মিথ্যে হবার নয়। ঈশ্বর আস্তে আস্তে এঁড়ে গরুর চেয়েও একগুঁয়ে হয়ে উঠেছে। কারো কথা শোনে না, নিজে যা ভালো বোঝে ঈশ্বর বরাবর তাই করে। গুরুতর লোক উপদেশ দিলেও ঈশ্বর ঘাড় বাঁকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠাকুরদাস প্রহার করেও ফল পান না। ঈশ্বর নিজের জিদ বজায় রাখবেই। সেজন্য ঠাকুরদাস ঈশ্বরের নাম দিয়েছেন—ঘাড়কেন্দো। অর্থাৎ, ঘাড় বাঁকালে সোজা হওয়ার নয়।

কাজকর্ম শেষ করে ঠাকুরদাসের বাসায় ফিরতে রাত নটা বেজে যেত। বাসায় ফিরে যদি ঠাকুরদাস কোনোদিন দেখতেন, ঈশ্বর ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রদীপ জ্বলছে, তাহলে আর নিস্তার নেই। ঘুমন্ত ঈশ্বরকে তুলে মারধোর করতেন। ঈশ্বরের কান্না শুনে ও-বাড়ির মেয়েরা ছুটে আসতেন, বলতেন—এত মার খেয়ে মরে যাবে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের বাড়িতে ব্রহ্মহত্যা করে আমাদের পাতকগ্রস্ত করবেন না। এরকম মারধোর করতে হলে আপনি এ-বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।

মারের ভয়ে ঈশ্বর জেগে থাকত। অনেক সময় ঘুম তাড়াবার জন্য দু-চোখে প্রদীপের তেল লাগাত। যন্ত্রণায় ছটফট করত, ঘুম থাকত না চোখে। রাত জেগে পড়ত। আবার শেষরাত্রে বাবা ঈশ্বরের ঘুম ভাঙাতেন। ঈশ্বরকে মুখে মুখে শ্লোক শেখাতেন। গঙ্গাস্নান সেরে এসে নিয়মিত প্রাতঃসন্ধ্যা করে ঈশ্বর। একবার সন্ধ্যা ভুলে গেল। কিন্তু সেকথা কাউকে জানতে দিল না। সন্ধ্যা করার সময় এমনভাবে হাত-টাত নাড়ত যেন সবকিছু ঠিকই মনে আছে।

ঈশ্বরের কাকা, নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে জানে কেন, একদিন সন্দেহ করলেন। কিন্তু সরাসরি কিছু বললেন না। ঈশ্বরকে বললেন—আমরা সন্ধ্যা ভুলে গেছি। বিশেষত আমরা বিষয়ী লোক, তুমি সংস্কৃত পড়েছ, তোমার শুদ্ধ হবে, অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আবৃত্তি কর, আমি শুনতে চাই।

সব তো ভুলে গেছে, কিছুই বলতে পারল না ঈশ্বর।

কালিদাস ঠাকুরদাসকে বলে দিলেন – ঈশ্বর সমস্ত ভুলে গেছে। মিছিমিছি কেবল হাত-টাত নেড়ে কাজ সারে। ঠাকুরদাস বিলক্ষণ প্রহার করলেন ঈশ্বরকে। বললেন – সন্ধ্যা শেখা না হলে কিছু খেতে দেব না। পুঁথি দেখে আবার সন্ধ্যা মুখস্থ করল ঈশ্বর।

ঠাকুরদাসের হাতে চালাকাঠের মার খেয়ে একদিন ঈশ্বর পালিয়ে গিয়েছে রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। রামধন সংস্কৃত কলেজের কেরানী। রামধন সযত্নে ঈশ্বরকে নিজের বাড়িতে রেখেছেন, খাওয়া-দাওয়া করিয়েছেন। তারপর ঈশ্বরকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের শরীর বেশ মজবুত। বেটে-খাটো বটে, কিন্তু খুব গ্যাঁটা-গোটা। সাধু ভাষায় যাকে বলে ‘অবষ্টক’। গ্যাঁটা-গোটা বলে কলেজে অনেকে ঈশ্বরকে আদর করে ‘টিপলে’ বলে ডাকে। যখন ঈশ্বর কোনো একটা দুরূহ প্রশ্নের সুন্দর করে উত্তর করে দেয়, কেউ কেউ বলে – আমাদের টিপলে না হলে এরকম আর কে করে দিতে পারে।

সাকুল্যে বারো বছর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেজে পড়েছে ঈশ্বর। অনেকবার পুরস্কার পেয়েছে, বৃত্তি পেয়েছে।

বৃত্তির টাকায় ছাত্রদের বিস্তর মিষ্টি-মিঠাই খাইয়েছে ঈশ্বর। দারোয়ানের কাছ থেকে টাকা ধার করে গরীব ছাত্রদের নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে। আর ঈশ্বর নিজে? চরকায় সুতো কেটে মা কাপড় তৈরি করে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। সেই কাপড় পরত।

পুজোর ছুটিতে ঈশ্বর যখন দেশের বাড়িতে যেত, গরীব-দুঃখীদের সাধ্যমতো সাহায্য করত। অন্যের কাপড় নেই, গামছা পরে ঈশ্বর নিজের কাপড়চোপড় এককথায় বিলিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরকে তখন কে দয়া করে ঠিক নেই, ঈশ্বর নিজেই অন্যকে দয়া করে যাচ্ছে।

বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বর পরম দয়ালু।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “মাতৃদেবীর অনুকরণে আত্মীয় লোকের পীড়া হইলে তাহাদের বাটীতে যাইয়া (ঈশ্বরচন্দ্র) শুশ্রূষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ কার্য্যে কিছুমাত্র ঘৃণা ছিল না। নিঃসম্পর্কীয় অর্থাৎ কোনরূপ সংশ্রব না থাকিলেও পীড়িত লোকের মলমূত্র সহস্তে পরিষ্কার করিতেন। পীড়িত লোকের শুশ্রূষাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিতেন। যে সকল সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীকে অপরে স্পর্শ করিতেও ভীত হইত, তিনি নির্ভয়ে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সেইরূপ রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে ভীত হইতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে পরম দয়ালু ছিলেন। তাঁহার এবম্বিধ গুণ থাকায় তৎকালে কলেজের সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কলকাতায় যেমন, ছুটিতে বীরসিংহ গিয়েও ঈশ্বর তেমনি অন্যের দুঃখে কাতর ও সক্রিয়। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “পূজার অবকাশে দেশে আগমন করিলে যে যে প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইয়াছেন শুনিতেন,(ঈশ্বরচন্দ্র) তাহাদের বাটীতে অবস্থা সর্ব্বদা যাইতেন এবং তাদের শুশ্রূষাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ঘৃণা প্রকাশ বা ক্লেশ বোধ করিত, কিন্তু অগ্রজ যে কোন জাতীয় লোকের পীড়া হইলে সম্ভ্রষ্ট চিত্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, একারণ তৎকালে দেশস্থ লোক দাদাকে দয়াময় বলিত। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সামান্য বিড়াল বা কুকুর মরিলেও দেখিয়া তাঁহার চক্ষু জল আসিত; কোন লোক রোদন করিলে তিনিও তাহাদের সহিত রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন।” বাল্যকাল থেকেই যার হৃদয়ে এত দয়া, কোনোকালেই কি তার জীবনে সুখশান্তির আশা আছে?

সংস্কৃত কলেজে অনেক শ্রেণী। ঈশ্বর প্রথম ভর্তি হয়েছে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে। ১৮২৯ সালের জুন থেকে ১৮৩৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত পড়েছে সেই শ্রেণীতে।

“প্রথম তিন বৎসরে মুক্তবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম।”

ভর্তি হওয়ার দেড় বছর পরে ১৮৩১ সালের মার্চ মাস থেকে ঈশ্বর মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়েছে। কৃতি ছাত্রেরা কলকাতায় বাসা-খরচের জন্য এই বৃত্তি পেত। যারা বৃত্তি পেত তাদের বলা হত পে-স্টুডেন্ট; যারা বৃত্তি পেত না, তাদের বলা হত আউট-স্টুডেন্ট।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তখন ব্যাকরণে তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক। “শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পুণ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্যে বিলক্ষণ দক্ষ সাতিশয় যত্নবান ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী ছিলেন বলিয়া অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।”

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পরপর তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বর তিন বারই পুরস্কার পেয়েছে। ১৮৩০-৩১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে আউট-স্টুডেন্ট রূপে ব্যাকরণ ও নগদ আট টাকা। ১৮৩১-৩২ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে অমরকোষ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস। ১৮৩২-৩৩ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে পে-স্টুডেন্ট রূপে নগদ দু-টাকা। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর পরীক্ষায় উত্তমরূপে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এক বৎসর অপর মন্দ বালক ভাল প্রাইজ পাইল দেখিয়া, তাঁহার মনে এত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, কলেজে আর অধ্যয়ন করিব না, দেশে যাইয়া দন্ডিপুরে বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসামশায়ের টোলে অধ্যয়ন করিব, এই স্থির করিয়াছিলেন। পিতৃদেব এবং তর্কবাগীশ ও মধুসূদন বাচস্পতির অনুরোধের বশবর্তী হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।”

ভালো করে লেখাপড়া শেখার জন্য ঈশ্বরের যত্নের অন্ত নেই। প্রায়ই ঠাকুরদাসকে বলত –রাত দশটার সময় খেয়ে উঠে শুয়ে পড়ব। রাত বারোটা বাজলে আপনি আমায় তুলে দেবেন, নয়তো আমার পড়া হবে না।

খেয়ে উঠে ঠাকুরদাস দু-ঘণ্টা বসে থাকতেন। আরমানি গির্জার ঘণ্টা শুনে ঈশ্বরকে জাগিয়ে দিতেন। ঈশ্বর সারারাত পড়ত।

উত্তরকালে লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন: “গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় একদিন গল্পচ্ছলে কহিলেন ঈশ্বর এই আট বছরের ছেলে বীরসিংহ গ্রাম হইতে কলিকাতা আসিবার সময় পদব্রজে আমাদিগের সঙ্গে সমভাবে ২৬ ক্রোশ পথ দুই দিবসে আসিয়াছে। এবং উহার বুদ্ধিমত্তা ও মেধাশক্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। একদিন আমি ও ঠাকুরদাস উভয়ে ইংরাজী বিল সমূহের ঠিক দিতে ভুলিতেছি। ঈশ্বর তথায় বসিয়াছিল কহিল আপনারা অস্থির হইয়াছেন সেই জন্য ভুল হইতেছে। আমি ভুল বাহির করিয়াছি। আমি কহিলাম তুমি কি ইংরাজী অঙ্ক চিন? ঈশ্বর কহিল শেয়াখালা হইতে শালিখার ঘাট দশক্রোশ পথ, সেই দশ ক্রোশ মধ্যে কুড়ীখানি মাইল স্টোনের চিহ্ন দেখিয়া ইংরাজী অঙ্ক শিখিয়াছি। আমি কহিলাম সে ত সোজা এ যে বাঁকা। ঈশ্বর উত্তর করিল দেখুন ও বাঁকা লেখা সোজা ভাবে বুঝিয়া লইব। তখনই পরীক্ষার জন্য বিলগুলি তাহাকে দিলাম।

ঈশ্বর অনায়াসে অল্পক্ষণ মধ্যে নির্ভুল করিয়া ঠিক দিয়া দিল। তখন আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। ইহা শুনিয়া গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন আজি হইতে তুমি আমার প্রিয়পাত্র হইলি।”

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজি শেখানোর জন্য ১৮২৭ সালের ১-মে থেকে ওলাস্টন নামে একজন সাহেব বহাল হয়েছেন। সব ছাত্রকেই ইংরেজি পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই, যাদের ইচ্ছা হবে তারা পড়তে পারে। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পড়তে-পড়তেই ঈশ্বর ইংরেজি-শ্রেণীতে এসেছে—১৮৩০ সালের কথা। ১৮৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজি ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বর পুরস্কার পেয়েছে : History of Greece আর Reader etc. ১৮৩৪-৩৫ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্ররূপে পুরস্কার পেয়েছে : Poetical Reader No.3 আর English Reader No.2 কিন্তু ১৮৩৫ সালের নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজি-শ্রেণী উঠে গেল।

২.৩ সারাংশ (প্রথম অংশ)

১৮২৯ সালের ১লা জুন ঈশ্বর ভর্তি হয় সংস্কৃত কলেজে। তখন তার বয়স ন’বছর। দিনের পর দিন ঈশ্বর বড় বাজারের বাসা থেকে বাবার সাথে পটলডাঙ্গার কলেজ যেত এবং বিকেল চারটের সময় বাবা ঈশ্বরকে কলেজ থেকে নিয়ে আসতেন। ছাতা মাথায় দিয়ে ছোটখাটো মানুষ ঈশ্বর কলেজে যায়। ঈশ্বরের মাথাটি বেশ বড়ো-সড়ো। কলেজের ছেলেরা ঠাট্টা করত ‘যশুরে কৈ, কসুরে জৈ’ বলে। ঈশ্বর প্রতিদিন রাত্রে বাবার কাছে পড়া দিত। লেখাপড়া ছাড়াও রান্নার কাজ করতে হত তাকে। একটি ভাত পাতের পাশে পড়ে থাকলে ঠাকুরদাসের কাছে রেহাই ছিলনা। ঈশ্বররা গরিব। অনেক সময় লবণ দিয়ে ভাত খেতে হত। রান্নাঘরটা ছিল অন্ধকার। খাবার সময় এক ঘটি জল নিয়ে বসত। রান্নাঘরে আরশোলা খুব উৎপাত করত। ঈশ্বর স্বভাবে একগুঁয়ে ছিল। গুরুজন উপদেশ দিলে ঈশ্বর ঘাড় বাঁকিয়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এইজন্য ঠাকুরদাস ঈশ্বরের নাম দেন ঘাড়কঁদো। ঠাকুরদাসের বাসায় ফিরতে রাত ন’টা হত। রাতে প্রদীপ চলা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে খুব মারধর করতেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বরের কাকার নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠাকুরদাসের কাছে মার খেয়ে ঈশ্বর চলে যায় রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি। রামধন সংস্কৃত কলেজের কেরানি। কলেজের অনেকে ঈশ্বরকে অবষ্টক বলত। বারো বছর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেজে লেখপড়া করে ঈশ্বর। চরকায় সুতো কেটে মা বীরসিংহ থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। পুজোর যখন ছুটি থাকত সে দেশের বাড়িতে যেত। গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করত যথাসাধ্য। বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বর পরম দয়ালু। ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজে প্রথম ভর্তি হয় ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রথম তিন বছর মুঞ্চবোধ পাঠ শেষ করে। শেষ ছয় মাস অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত পড়ে। ১৮৩১ সাল থেকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পেত। তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন গঙ্গাধর বিদ্যাবাগীশ। ১৮৩০-৩১ সালে আউট স্টুডেন্ট রূপে ব্যাকরণ ও নগদ আট টাকা পুরস্কার পায়। ১৮৩২-৩৩ সালে বার্ষিক পরীক্ষায় পে-স্টুডেন্ট রূপে পুরস্কার স্বরূপ নগদ দু’টাকা পায়। ঈশ্বর সারারাত পড়ত। সংস্কৃত কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন ওলাস্টন। ইংরেজি শিখে ঈশ্বর পুরস্কার পায়-History of Greece Reader। পরবর্তীতে ১৮৩৫ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজী-শ্রেণী উঠে যায়।

অনুশীলনী-১

নিচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ঠিক ভুল

ক) ১৮২৯ সালে ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়।

☐ ☐

খ) সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরের বয়স ছিল পনেরো।

☐ ☐

গ) ঈশ্বর বাগবাজারের বাসায় থাকত।

☐ ☐

ঘ) বিকেল চারটের সময় ঈশ্বরকে কলেজ থেকে নিয়ে আসত।

☐ ☐

ঙ) ঈশ্বরের বাড়ি ছিল বীরসিংহ গ্রামে।

☐ ☐

চ) ১৮৩১ সালে ১০ টাকা বৃত্তি পেত।

☐ ☐

ছ) ঈশ্বরের বাবার নাম ঠাকুরদাস।

☐ ☐

জ) সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক ছিলেন ওয়ারেনহেস্টিংস।

☐ ☐

ঝ) বেদান্ত শ্রেণীর অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি।

☐ ☐

ঞ) গদ্য ও পদ্য রচনার জন্য ৫০০ টাকা বৃত্তি পায়।

☐ ☐

২) নিচের বিবৃতিগুলির নিচে নিচে দেওয়া উত্তরগুলির মধ্যে যেটি সঠিক তার ডানপাশের ঘরে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(ক) সংস্কৃত কলেজে ভর্তির সময় ঈশ্বরের বয়স ছিল।

৫ বছর

☐

৬ বছর

☐

৭ বছর

☐

৯ বছর

(খ) যা মাথায় দিয়ে ঈশ্বর কলেজ যেতো-

টুপি

ছাতা

ব্যাগ

কোট

(গ) ঈশ্বর বাবার কাছে পড়া দিত

সকালে

দুপুরে

সন্ধ্যায়

রাতে

(ঘ) খাবার সময় ঈশ্বর কি নিয়ে বসত?

একঘটি জল

একঘটি দুধ

একবাটি পায়ের

একবাটি মাংস

(ঙ) ঈশ্বরের স্বভাব

রাগী

সাহসী

নিষ্ঠুর

একগুঁয়ে

(চ) লোকের উপদেশে মুখর হয়ে ঈশ্বর

হাত বাঁকিয়ে থাকত

ঘাড় বাঁকিয়ে থাকত

মাথা উঁচু করে থাকত

চোখ বন্ধ করে থাকত

(ছ) ঈশ্বরের মা সুতো কাটতেন

চরকায়

মেশিনে

হাতে

কাপড় কলে

(জ) ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয় ব্যাকরণের

প্রথম শ্রেণীতে

দ্বিতীয় শ্রেণীতে

তৃতীয় শ্রেণীতে

চতুর্থ শ্রেণীতে

৩। নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন।

(ক) ছোট

(খ) কাছে

(গ) রাত

(ঘ) অন্ধকার

(ঙ) শেষ

(চ) পদ্য

(ছ) যাওয়া

(জ) সূক্ষ্ম

(ঝ) আশ্রয়

(ঞ) নগদ

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) ঈশ্বর মাসিক বৃত্তি পেত _____ টাকা।

(খ) সংস্কৃত কলেজের _____ কাছ থেকে দু টাকা নিয়ে যায়।

(গ) রামধন সংস্কৃত কলেজের _____।

(ঘ) সংস্কৃত কলেজে জন মিয়ার সাহেব _____।

(ঙ) সংস্কৃত কলেজে গদ্য ও পদ্য রচনার জন্য ঈশ্বর পায় _____ টাকা।

(চ) _____ অনুরোধে পদ্য রচনায় হাত দেয়।

(ছ) ঈশ্বর স্বভাবে _____।

(জ) কলেজের ছেলেরা ঠাটা করত যন্ত্রে কৈ _____ বলে।

(ঝ) মাসিক বৃত্তির টাকা _____ হাতে তুলে দিত।

(ঞ) ১৮৩০-৩১ সালে নগদ _____ টাকা পুরস্কার পায়।

২.৪ মূল পাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

প্রত্যেক বছর বাড়িতে ঘটা করে সরস্বতী পূজা করতেন জয়গোপাল। অনেক ছাত্রকে নেমন্তন্ন করতেন। পূজোর দিন ছাত্রেরা জয়গোপালের বাড়িতে দুবেলা দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করত, আর রাত্রে গান শুনত। সরস্বতী পূজোর দিন ওদের আমোদের আর অন্ত নেই।

সরস্বতী পূজোর আগের দিন জয়গোপাল উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের পদ্যে সরস্বতীর বর্ণনা করতে বলতেন। ঈশ্বর কখনো সে-বর্ণনা লিখতে রাজি হত না। মাত্র একবার ঈশ্বর এড়াতে পারেনি জয়গোপালকে। তাঁর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ঈশ্বর মাত্র একবার একটি শ্লোকে সরস্বতীর বর্ণনা করেছে, সরস্বতীর নামে একটি সরস শ্লোক লিখেছে। শ্লোক দেখে খুব খুশি হয়েছেন জয়গোপাল। অনেককে ডেকে এনে জয়গোপাল নিজে ঈশ্বরের শ্লোক পড়ে শুনিয়েছেন।

ভারি মজার শ্লোকটি:

‘লুচি কচুরী মতিচূর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্তুমঃ
সরস্বতী সা জয়তন্নিস্তরম্।’

শ্লোক নিয়ে আরেকটা বলবার মতো ঘটনা আছে।

১৮৩৮ সালের একদিন। কলেজের সেক্রেটারি সব ছাত্রকে বললেন – জন মিয়র নামে একজন সাহেব লিখেছেন, পরমেশ্বরের মহিমা সম্পর্কে যে ছাত্র সকলের চেয়ে ভালো একশোটি শ্লোক লিখতে পারবে, তাকে তিনি কিছু নগদ টাকা পুরস্কার দেবেন।

প্রায় সব ছাত্র পরে আলাপ আলোচনা করে সাব্যস্ত করল, পুরস্কারের টাকা পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, অতএব পরিশ্রম করে শ্লোক লেখার দরকার নেই।

কিন্তু দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় নামে একটি ছাত্র বলল – টাকা পাই আর না পাই আমি ওই একশোটি শ্লোক লিখব।

লিখল। এবং নগদ টাকা পুরস্কার পেল।

কিছুদিন পরে আবার আরেক খবর এল। মেয়র সাহেব আবার পুরস্কার দেবেন, নগদ টাকাই পুরস্কার দেবেন। তবে এবার আর পরমেশ্বরের মহিমা নিয়ে নয়, পদার্থবিদ্যা নিয়ে। পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যার একশো শ্লোক সবচেয়ে ভালো হবে, সেই ছাত্র পুরস্কার পাবে।

এবার অনেক ছাত্রই সাব্যস্ত করল, লিখবে। সত্যি-সত্যি পুরস্কারের টাকা পাওয়া যাচ্ছে।

পাঁচ সাত দিন পরের কথা। একই শ্রেণীর একটি ছেলে এসে ঈশ্বরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—তুমি কি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে লিখবে?

ঈশ্বর বলল—আমার ইচ্ছা নেই। কিন্তু অধ্যাপক মশায়েরা বড়ো পীড়াপীড়ি করছেন, যদি তাঁদের এড়াতে না পারি, অগত্যা লিখতে হবে।

—দ্যাখো, এবার অনেকেই শ্লোক লিখবে। কিন্তু, যদি আমরা দু-জনে মিলে লিখি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পুরস্কার পাব। এস, আমরা দু-জনে ভাগাভাগি করে শ্লোক লিখি, তুমি পঞ্চাশটি লেখ, আমি পঞ্চাশটি লিখি। তারপর, হয় তোমার নামে, না হয় আমার নামে, একশোটি শ্লোক কর্তৃপক্ষের হাতে দেব। পুরস্কার পেলে দু-জনে সমান ভাগে ভাগ করে নেব।

গোড়ায় ঈশ্বর এ-কথায় রাজি হয়নি। ছেলেটির অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের হাতে সব শ্লোক যেদিন দেবার কথা তার দশ-বারো দিন আগে ওই ছেলেটি ঈশ্বরকে বলল—দ্যাখো, নানা কারণে আমার ভাগের পঞ্চাশটি শ্লোক লেখা হল না। তুমিই পুরোপুরি একশোটি শ্লোক লিখে দাও।

ঈশ্বর বলল—দ্যাখো, আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কেবল তোমার পীড়াপীড়িতেই এই কাজ করেছি। তুমি যখন করলে না, আমিও করব না। তাছাড়া, সব যোগাড় করে আরো পঞ্চাশটি শ্লোক লেখার আর সময় নেই। এই অবস্থায় এ-বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভালো।

বলে ওই ছেলেটির সামনেই নিজের লেখা শ্লোকগুলো ঈশ্বর ছিঁড়ে ফেলে দিল।

কর্তৃপক্ষের হাতে সব শ্লোক যেদিন দেবার কথা, আশ্চর্য কাণ্ড, ওই ছেলেটিও সেদিন নিজের লেখা একশোটি শ্লোক দাখিল করল। দেখে অবাক হয়ে গেল ঈশ্বর। এই ঘটনার আগে ঈশ্বর কখনো ধারণা করতে পারেনি যে কেউ কারো সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত চাতুরী করতে পারে।

কিছুদিন পরে আবার আরেক পুরস্কারের পালা। ওই মিয়র সাহেবই পুরস্কার দেবেন, নগদ টাকাই পুরস্কার দেবেন। এবার শ্লোক লিখতে হবে ভূগোল-খগোল বিষয়ে।

সেবার পুরস্কার পেল ঈশ্বর। ওই চতুর ছেলেটির পক্ষে দুঃসংবাদ নিশ্চয়ই।

এই পুরস্কার পেল যখন, ঈশ্বর তখন ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্র।

অন্যরকম একটি ঘটনার এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। উত্তরকালে লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন :

“ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি তিন সহোদর ও তাহাদিগের জনক ঠাকুরদাস যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাটীর পার্শ্ববর্তী পল্লীতে বিসূচিকা (কলেরা) রোগ অতি প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হইল। প্রত্যহ অনেক ব্যক্তি যমসদনের আতিথ্য

গ্রহণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ পীড়াকে অতি মারাত্মক এখনকার প্লেগ রোগের ন্যায় বিশেষ সংস্পর্শক্রান্ত রোগ মনে করিত। এখনও যে মনে করে না তাহা নহে।

ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা জগদ্বল্লভ সিংহের কোন পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কহিল আপনার পরিচিত অমুক সপরিবারে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সে একান্ত দরিদ্র। কেহ তাহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইবে এমন উপায় দেখি না। ঈশ্বরচন্দ্র তথায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি শুনিয়া কাহাকেও কিছু কহিলেন না। আন্তরিক বড়ই ব্যথা পাইলেন। সন্ধ্যার পরেই পাক সমাধা করিয়া দীনবন্ধু ও শম্ভুকে আহাৰ করাইয়া পিতার ভোজনের আয়োজন করিয়া সেই পীড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারা পাঁচ জনেই শয্যাশায়ী হইয়াছে জল পিপাসায় অত্যন্ত কাতর। মধ্যে মধ্যে তাহারা বমি ও মলত্যাগ করিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক গৃহস্থের বাটী হইতে এক কলসী জল আনিলেন এবং চকমকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। তিনি সকলকে জল পান করাইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা হরচন্দ্র ওলাউঠা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তদবধি তাহার মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে যদি কেহ ওলাউঠা রোগীর পিপাসা দূর করিতে পারে তাহা হইলে শতকরা বারো আনা লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে। একদিন একটা নিমন্ত্রণ সভায় ডাক্তার রূপচাঁদবাবুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে ওলাউঠা রোগে রোগিকে যত জল খাওয়াইতে পারিবে ততই তাহার উপকার হইবে।...

ঈশ্বরচন্দ্র রূপচাঁদবাবুর অশেষণে যাইতেছেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহার সহিত পথিমধ্যে দেখা হইল। ঈশ্বরচন্দ্র রোগীদিগের অবস্থা সমুদায় যথার্থ রূপচাঁদবাবুকে কহিলেন। রূপচাঁদবাবু বলিলেন চল পুলিশে একবার জানাই। গভর্নমেন্ট হইতে যদি অনাথ ব্যক্তিবর্গের কিছু সাহায্য করিতে পারি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও নবাব নেজামত হইতে দুঃখী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য পুলিশের হাতে টাকা ও ঔষধ আছে। উভয়ে বড় বাজারে পুলিশের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুলিশ সাহেবকে সংবাদ দিবা মাত্র তিনি কতকগুলি ঔষধের পীল দিলেন। এবং কহিলেন খুব সমাধান যেন জল অনেক না খায়। জল না খাইলে ভাল হয়। রূপচাঁদ কহিলেন সাহেব আপনার উপদেশানুসারেই চলিব। কিন্তু এখন তাহাদিগের মলমূত্র পরিষ্কারের জন্য একটা লোক আবশ্যিক। সাহেবও অতি দয়ালু ও উচ্চ বংশের লোক ছিলেন। তিনি একটি মেথরানীকে সরকার হইতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং পথের খরচা যাহা লাগিবে তাহার জন্য সর্কারে বিল করিতে বলিলেন। রূপচাঁদ কহিলেন কে অগ্রে খরচ দিবে যে পরে বিলের টাকা আদায় হইলে সে উহা পরিশোধ করিয়া লইবে। সাহেব কহিলেন আমি নিজ হস্তে দুইটি টাকা দিলাম। ইহা আমার নিজের দান জানিবেন। এখন রূপচাঁদ ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া রোগীদিগের নিকট আসিলেন। রোগীদিগকে দেখিয়াই কহিলেন বড় মন্দ অবস্থা। পুলিশের পীল খাওয়াইয়া উহাদিগকে অনর্থ কষ্ট দিও না কেবল জল খাওয়াও। যদি উপকার হয় ইহাতেই হইবে। মেথরানী স্বারা মল অ বমি পরিষ্কার করাইয়া লও। আমি বাটী হইতে পুরাতন ধৌত কাপড় পাঠাইয়া দিতেছি। তাহা জলে ভিজাইয়া উহাদিগের গাত্র মার্জনা করিবে। রূপচাঁদ ডাক্তার বাটী যাইয়া দুইটি বেদানা কিঞ্চিৎ এক কলসী উত্তম পানীয় জল ও ধৌত বস্ত্রখণ্ড পাঠাইয়া দিলেন।

মেথরানী বিষ্ঠা ও বমনের অপবিত্রতা মাত্র দূরীভূত করিয়া প্রস্থান করিল। ঈশ্বর এখন একাকী রোগীদিগকে রূপচাঁদবাবুর উপদেশানুসারে পিপাসার জল যোগাইতেছেন। ক্রমে শিশুদ্রয় কথা কহিল। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের মনে শ্রম সার্থক বোধ হইতে লাগিল। এই সময় তাহার মনে মানবীয় ধর্মশাস্ত্রের বচন উদ্ভিত হইল।

জলেন পাচয়েদন্নং জলে জীবধঃ দৃশ্যতে।

এবং অগ্নিপু্রাণের চিকিৎসা প্রকরণের যথা শ্রুত বচনও তাহার চিত্ত ক্ষেত্রে উদিত হইল।

অজীর্ণে ভেষজং বারি জীর্ণে বারি বল প্রদং।

এইরূপে রাত্রি অবসান কালে স্ত্রীলোকটি কহিল বাবা তুমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছ। একবার বাবুদিগের বৈঠকখানায় শয়ন কর। বাবুরা অতি ভদ্র লোক। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝিলেন ইহারও উপকার হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি ভাবিল এমন দয়াময় বালক যদি না ঘুমাইয়া পীড়িত হয় তবে তাহাদিগকে আর কে দেখিবে। ঈশ্বরচন্দ্র দিবার প্রথম ভাগ তাহাদিগের নিকট অতিবাহন পূর্বক তাহাদিগকে মিছিরি ও বেদানা পথ্য দিয়া বাসায় প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান সময়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান সমাধা করিয়া না গেলে বাসার লোক ও গৃহস্থ জগদ্বল্লভবাবু যদি শুনেন যে ওলাউঠা রোগীর সেবায় নিযুক্ত ছিল সংস্পর্শক্রান্ত রোগ – অনায়াসে বাসায় প্রবিষ্ট হইবে। বিশেষতঃ রাত্রি জাগরণের পর স্নান করাই সর্বতোভাবে বিধেয়। সেইজন্য বড়বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাইলেন। তথায় রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন রোগীরা কিরূপ আছে। ঈশ্বর কহিলেন সমস্তই মঙ্গল। রূপচাঁদ কহিলেন তোমাকে আর দুই দিন ভুগিতে হইবে। ঈশ্বর কহিলেন তাহাও কি আপনাকে কহিতে হইবে। উহা আমার নিজের কর্তব্য জ্ঞান করিয়াছি। রূপচাঁদ কহিলেন আমার কর্তব্যও আমি করিব।

ঈশ্বরচন্দ্র স্নানান্তে বাসায় আসিলে দিনবন্ধু কহিলেন দাদা কালি আপনি রাত্রিতে গিয়েছেন এখন কত বেলা হইয়াছে দেখুন দেখি। আমাদিগের আহালাদি কিছুই হয় নাই। বাবা আপনাকে মধুসূদন ঠাকুরদাদার বাসায় অনুসন্ধান গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র কোন কথা না বলিয়া পাক আরম্ভ করিলেন। এমন সময় ঠাকুরদাস উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কালি রাত্রিতে কোথায় ছিলি কাহাকেও কিছু বলিস নাই। আমি বেলা হইল দেখিয়া মধুসূদনের বাসায় অনুসন্ধান গিয়াছিলাম। সে কহিল কালি তুমি তাহার সঙ্গে দেখাও কর নাই। সে আরও বলিল এ অঞ্চলে ওলাউঠার পীড়া প্রবলভাবে বিস্তৃত হইতেছে হয়ত কোন সতীর্থের পীড়ার সংবাদ পাইয়াছে তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য তথায় গিয়াছে। ঈশ্বরের অন্তঃকরণ অত্যন্ত মায়ায় আচ্ছন্ন পরোপকার করিতে পারিলে তাহার আত্মাদের সীমা থাকে না। এই কথা শুনিয়া বাসায় প্রত্যগমন করিলাম। ব্যাপারখানা কি বল দেখি শুন।

ঈশ্বরচন্দ্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। ঠাকুরদাসও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত আর কিছু কহিলেন না। পূর্ববৎ সকলের আহালাদি সমাধা হইয়া গেল। ঠাকুরদাস অফিস যাত্রা করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধুকে কহিলেন কলেজে যাইয়া আমাদিগের শ্রেণীর অধ্যাপককে কহিবি দাদা আজি এক স্থানে সংবাদ পাইয়াছেন তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য তিনি তথায় উপস্থিত থাকিবেন। তাহারা অতি দরিদ্র সুতরাং দাদা শুনিয়া থাকিতে পারিলেন না। দীনবন্ধুকে এই কথা বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্থান করিবেন।...

ঈশ্বরচন্দ্র রোগীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রূপচাঁদ ডাক্তার সভৃত্য তথায় উপস্থিত আছেন। রূপচাঁদ ঈশ্বরচন্দ্রকে কহিলেন তোমার সেবায় সকলেই জীবন পাইল এবং আমার জলচিকিৎসায় অব্যর্থ ফল দেখাইতে পারিলাম। তোমার মত প্রকৃত সুবুদ্ধি কন্মঠ এবং পরোপকারী ব্যক্তিকে না পাইলে আমার জলচিকিৎসার অব্যর্থ ফল দেখাইতে পারিতাম না। আজি হইতে তোমার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।”

১৮৩৯ সালের গোড়ার দিকে ঈশ্বর ন্যায় শ্রেণীতে এসেছে। এই শ্রেণীর অধ্যাপক তখন নিমাইচন্দ্র শিরোমণি। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে ঈশ্বর পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে সবচেয়ে ভালো ফলের জন্য একশো টাকা এবং সংস্কৃত পদ্য লিখে একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছে। বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে সংস্কৃতে একটা পদ্য লিখে ঈশ্বর একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছে বটে।

সে সময়ে বীরসিংহে গেলে ঈশ্বরের সঙ্গে অনেকের শাস্ত্রবিচার হয়েছে। বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে সকলেই ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করেছেন।

বীরসিংহের কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ করেছেন। সেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্রে সংস্কৃত কবিতা লিখে দিয়েছে ঈশ্বর। শ্রাদ্ধের দিন নানা জায়গা থেকে পণ্ডিতেরা এসেছেন। জানতে চেয়েছেন: কবিতা কার লেখা?

ঈশ্বরের লেখা। তারপর সকল পণ্ডিত শাস্ত্রবিচার করেছেন ঈশ্বরের সঙ্গে এবং পরাস্ত হয়েছেন। কুরাণগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন তর্কসিদ্ধান্ত বিচারে পরাস্ত হয়েছেন শুনে ঠাকুরদাস রামমোহনের বিস্তর স্তবস্তুতি করলেন, রামমোহনের পায়ের ধুলো নিয়ে ঈশ্বরের মাথায় দিলেন। রামমোহন ঠাকুরদাসকে বললেন – তোমার পুত্র ঈশ্বর যেমন কাব্য অলংকার স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র শিখেছে বাংলাদেশে এমন আর কেউ পারে না। ভবিষ্যতেও যে পারবে, এমন আশা করা যায়না। ঈশ্বরের প্রতি স্বরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি হয়েছে, না হলে এই অল্পবয়সে এত শাস্ত্র কেমন করে শিখল।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “যৎকালে অগ্রজ (ঈশ্বরচন্দ্র) ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণির অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চগনন পীড়িত হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় দাদাকে উপযুক্ত পণ্ডিত বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া ২ মাসের জন্য অগ্রজকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত থাকিয়া ৪০ টাকা প্রাপ্ত হন। সেই টাকা পিতৃদেবের হস্তে অর্পণ করে বলেন, এই টাকায় পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াধাম প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করুন। ছেলেমানুষ পিতাকে তীর্থক্ষেত্রে যাইতে উপদেশ দিতেছেন, এই কথায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম আত্মাদিত হইলেন।”

সেকালে যাঁরা আদালতে জজ-পণ্ডিত হতেন, তাঁদের হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় পাস করতে হত। ১৮৩৯ সালের ২২- এপ্রিল ঈশ্বর হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিল। পরীক্ষা দেওয়ার ছ-মাস আগের কথা। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “সাধারণ পণ্ডিতগণ ২/৩ বৎসরে যে সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতেন; তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) স্মৃতির সেই সকল গ্রন্থ ছয় মাসে মুখস্ত করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে পিতৃদেবকে বলিলেন, আমি ছয় মাস পাকাদিকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব না। সুতরাং তাঁহার অনুজ দীনবন্ধুকে ছয় মাস দুইবেলা পাকাদিকার্য্য সমাধা করিতে হইত। তখন মধ্যমাগ্রজ দিনবন্ধুর বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রাতঃকাল হইতে সমগ্র মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া আবৃত্তি করিতেন এবং ভোজনান্তে বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গাস্থ বিদ্যালয় যাইবার সময় পথে আবৃত্তি করিতে করিতে গমন করিতেন। কলেজে উপস্থিত হইয়া পড়া বন্ধ করিতেন। পুনরায় ৪ টার পর বাসা আসিবার সময় পথে আবৃত্তি করিতে করিতে বাসায় আসিতেন। রাত্রি দশটার সময় ভোজন করিয়া দুই ঘন্টা নিদ্রা যাইতেন। নিকটস্থ আলমাণি গিরজার ঘড়িতে রাত্রি বারটা বাজিলে পুনর্ব্বার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সমস্ত রাত্রি স্মৃতি আবৃত্তি করিতেন।”

ছ-মাস অনবরত এইরকম পরিশ্রম করেছে ঈশ্বর। কৃতিত্বের সঙ্গে ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং হিন্দু-ল কমিটি থেকে একখানা সার্টিফিকেট হয়েছে। এই সার্টিফিকেট পাওয়ার কিছুকাল পরে ত্রিপুরায় জজ পন্ডিতের একটা চাকরি খালি হওয়ার খবর পাওয়া গেল। সেই চাকরির জন্য ঈশ্বর দরখাস্ত করল। চাকরিটা পাওয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরদাস অমত করলেন বলে ঈশ্বরের আর ওই চাকরি করা হলো না।

২.৫ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

প্রতিবছর ঘটা করে জয়গোপাল বাড়িতে সরস্বতী পূজা করতেন। পূজোর দিন ছাত্রদের দুবেলা খাওয়া-দাওয়া দিত। বিকেল ও রাত গান শুনত। পূজোর আগের দিন ছাত্রদের পদ্যে সরস্বতী বন্দনা করতে বলতেন। মাত্র একবার ঈশ্বর এড়াতে পারেননি জয়গোপাল কে। জন মিয়র নামে একজন সাহেব বলেন পরম ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে যে ছাত্র একশোটি শ্লোক লিখতে পারবে টাকে নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। দিগম্বর নামে এক ছাত্র একশোটি শ্লোক লিখে পুরস্কার পায়। মিয়র সাহেব দ্বিতীয় বার ঘোষণা করলেন পদার্থবিদ্যা নিয়ে একশো শ্লোক লিখলে পুরস্কার পাওয়া যাবে। তৃতীয়বার মিয়র সাহেব ঘোষণা করলেন ভূগোল বিষয় নিয়ে। এইবার পুরস্কার পেল ঈশ্বর। ঈশ্বর তখন ন্যায় শ্রেণীর ছাত্র। ঠাকুর দাসের আশ্রয়দাতা জগদল সিংহের পরিচিত এক ব্যক্তি এসে জানায় তাদের পরিবার ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত। ঈশ্বর তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখল পাঁচজনই শয্যাশায়ী, জল পিপাসায় অত্যন্ত কাতর। ঈশ্বর তখন গৃহস্থের বাড়িতে জল আনলেন ও চকমকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালালেন। তিনি সকলকে জল পান করিয়ে ডাক্তার ডাকলেন। ঈশ্বরের ভ্রাতা হরচন্দ্র ওলাউঠা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ডাক্তার রূপচাঁদ বাবুর কাছে শোনে যে জল খাওয়াতে পারলে সেরে উঠবেন। ঈশ্বর ও রূপচাঁদ বাবু বড় বাজারে পুলিশের নিকট উপস্থিত হয়ে ঔষধের পীল সংগ্রহ করলেন। মলমূত্র পরিস্কারের জন্য সাহেব একটা মেথরানীকে নিযুক্ত করেছিলেন। সাহেব নিজেই দুই টাকা দিয়েছিলেন।

ন্যায় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন নিমাইচন্দ্র শিরোমণি। দর্শন শাস্ত্রে ভালো ফলের জন্য ঈশ্বর একশো টাকা ও সংস্কৃতে পত্র লেখার জন্য একশো টাকা পুরস্কার পান। তিন ঘন্টায় ঈশ্বর বিদ্যার তার প্রশংসা বিষয়ে আটটি শ্লোক লেখেন। বীরসিংহের কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাসমারোহে মাতৃ শ্রদ্ধ করেন এবং সেই শ্রদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রে ঈশ্বর সংস্কৃত কবিতা লিখে দেন। ঈশ্বর ১৮৩৯ সালে হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি সার্টিফিকেট পান। ত্রিপুরায় জজ পন্ডিতের চাকরিটা ঈশ্বর পেলেও বাবার অমতের কারণে চাকরি ছাড়তে হয়। ঈশ্বরের শখ ছিল কবিগানে।

অনুশীলনী-২

নিচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
ক) প্রতিবছর ঘটা করে জয় গোপালের বাড়িতে কালীপূজা হত।	☐	☐
খ) ঈশ্বর একবার মাত্র জয় গোপালকে এড়াতে পারেননি।	☐	☐
গ) ঠাকুর দাসের আশ্রয়দাতা মিয়র সাহেব।	☐	☐
ঘ) ঈশ্বরও রূপচাঁদ বাবু ঔষধের জন্য ত্রিপুরায় পৌঁছায়।	☐	☐
ঙ) তিন ঘন্টায় ঈশ্বর আটটি শ্লোক লেখেন।	☐	☐
চ) ত্রিপুরায় জজ পন্ডিতের চাকরিটা ছাড়েন বাবার অমতের কারণে।	☐	☐
ছ) ঈশ্বরের শখ ছিল ভাটিয়ালী গানে।	☐	☐
জ) ন্যায় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন নিমাইচন্দ্র শিরোমণি।	☐	☐

২। (ক)পুজোর আগের দিন সরস্বতীর বর্ণনা হত কীভাবে?

গদ্যে	
পদ্যে	
নাটকে	
ছন্দে	

(খ) পরমেশ্বরের মহিমা লিখে কে পুরস্কার পায়?

ঈশ্বর

জয়গোপাল

দিগম্বর

পিয়র সাহেব

(গ) ঈশ্বরের স্ত্রীর নাম-

ভগবতী

রমাময়ী

দীনময়ী

শোকময়ী

(ঘ) ভূগোল বিষয় নিয়ে ঈশ্বর যখন পুরস্কার পায় তখন সে কোন শ্রেণীর ছাত্র?

ন্যায়

জ্যোতিষ

ব্যাকরণ

দর্শন

(ঙ) ঈশ্বর হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়-

১৮৩৮ সালে

১৮৩৯ সালে

১৮৪১ সালে

১৮৪০ সালে

(চ) ঈশ্বর জর্জ পন্ডিতির চাকরি কোথায় পায়?

কেরলে

কলকাতায়

ত্রিপুরায়

আসামে

২.৬ সারসংক্ষেপ:

১৮২৯ সালে ১লা জুন ঈশ্বর যখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয় তখন তার বয়স নয় বছর। ছাতা মাথায় ছোটখাটো ঈশ্বর কলেজে যেত। ঈশ্বরের মাথাটা বড়োসড়ো তাই কলেজের ছেলেরা ঠাট্টা করত যশুরে কৈ কশুরে joi বলে। প্রতিদিন রাতে বাবার কাছে পড়া দিত। লেখাপড়া ছাড়াও রান্নার কাজ করতে হতো তাকে। ঈশ্বরের গরিব অনেক সময় লবণ দিয়ে ভাত খেতে হত। খাবার সময় এক ঘটি জল নিয়ে বসত। ঈশ্বর স্বভাবে ছিল একগুঁয়ে প্রকৃতির। কে উপদেশ দিলে ঈশ্বর ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো তাই ঠাকুরদাস বলতেন (ঘারকেদো)। ঠাকুর দাস এর বাড়ি ফিরতে রাত ন'টা হত। ঠাকুরদাস মারলে ঈশ্বর রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি পালিয়ে যেত। বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বর পরম দয়ালু। পুজোর ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে গরিব মানুষদের সাহায্য করত। ১৮৩০-৩১ সালে নগদ ৪ টাকা পুরস্কার পায়। সংস্কৃত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপকের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে। ঈশ্বরের প্রতিভা পরীক্ষার জন্য জয়গোপাল ঈশ্বরকে কবিতা ব্যাখ্যা করতে বলেন। বেদান্তের অধ্যাপক শম্ভুনাথ কে ঈশ্বর পরামর্শ দিতেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব। জয় গোপাল এর অনুরোধে ঈশ্বর পদ্য লেখায় হাত দেয়।

জয় গোপালের বাড়িতে প্রতিবছর সরস্বতী পূজা হতো এবং পুজোর দিনে দুবেলা ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া দিত। ভূগোল বিষয় নিয়ে লিখে ঈশ্বর যখন পুরস্কার পায় তখন সে ন্যায় শ্রেণীর ছাত্র। জগদল এর পরিবার ওলাওঠা রোগ আক্রান্ত হলে ঈশ্বর নিজে তাদের সেবা করে। গৃহস্থের বাড়ি থেকে জল এনে খাওয়ায়। ডাক্তার রূপচাঁদ বাবুকে নিয়ে বড় বাজারে পুলিশের কাছ থেকে বিল সংগ্রহ করে এক মেথরানী কে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত ওলাওঠা মানুষের সেবা করে। হাজার ১৮৩৯ সালে হিন্দোল কমিটির পরীক্ষায় একটি সার্টিফিকেট পায় গ্রামে গিয়ে কপাটি খেলত, লাঠি খেলত ঈশ্বর। কাস্তে নিয়ে মাঠে ধান কাটা ধান বয়ে আনার কাজও করেন। ঈশ্বরের মাসিক বৃত্তি ১৮৪১ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর অসুখে পড়লে বড় বাজারের বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়ির খোঁজ করে বউবাজারে উপস্থিত হয়। ১৪ বছর বয়সে বিয়ে করেন দীনময়ী কে। সংস্কৃত কলেজে পড়তে পড়তে কার উপাধি হয় বিদ্যাসাগর।

অনুশীলনী -৩ (ভাষাদক্ষতা বিষয়ক)

নিচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিম্নলিখিত চলিত শব্দগুলিকে সাধু শব্দে রূপান্তরিত করুন।

ক) যেত

খ) করতেন

গ) হয়েছেন

ঘ) করত

ঙ) বলে

চ) আসত

ছ) শুনতেন

ঝ) যাচ্ছে

জ) দেখে

ঞ) তাদের

২। নিচের শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লিখুন।

ক) ছোট

খ) কাপড়

গ) কলেজ

ঘ) ঘুম

ঙ) মাথা

চ) সন্ধ্যা

ছ) জল

জ) বাসন

ঝ) খাওয়া

ঞ) রাত

৩। নিচের প্রদত্ত শব্দগুলির মধ্যে দেশি ও বিদেশি শব্দ নির্ণয় করে ডানপাশের ঠিক ঘরে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক) কলেজ

খ) বৃত্তি

গ) সেক্রেটারি

ঘ) ডাক্তার

ঙ) খবর

চ) সার্টিফিকেট

২.৭ নির্বাচিত পাঠ্য

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর(সংস্কৃত কলেজ পর্ব-৪)

২.৮ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী-১

১।

(ক) ঠিক

(খ) ভুল

(গ) ভুল

(ঘ) ঠিক

(ঙ) ঠিক

(চ) ভুল

(ছ) ঠিক

(জ) ভুল

(ঝ) ঠিক

(ঞ) ভুল

২।

- (ক) ৯ বছর
(খ) ছাতা
(গ) রাতে

- (ঘ) এক ঘটি জল
(ঙ) একগুঁয়ে
(চ) ঘাড় বাঁকিয়ে

- (ছ) চরকায়
(জ) তৃতীয়

৩।

- (ক) বড়
(খ) দূরে
(গ) দিন
(ঘ) আলো

- (ঙ) শুরু
(চ) গদ্য
(ছ) আসা
(জ) ভুল

- (ঝ) নিরাশ্রয়হীন
(ঞ) বাকি

৪।

- (ক) পাঁচ টাকা
(খ) দারোয়ান
(গ) কেরানী

- (ঘ) পুরস্কার দিতেন
(ঙ) একশো টাকা
(চ) একগুঁয়ে

- (ছ) কণ্ডরে জৈ
(জ) বাবার হাতে
(ঝ) আট টাকা

অনুশীলনী-২

১।

- (ক) ভুল
(খ) ঠিক
(গ) ভুল

- (ঘ) ভুল
(ঙ) ভুল
(চ) ঠিক

- (ছ) ভুল
(জ) ঠিক

২।

- (ক) পদ্যে
(খ) দিগম্বর

- (গ) দীনময়ী
(ঘ) ন্যায়

- (ঙ) ১৮৩৯
(চ) ত্রিপুরায়

অনুশীলনী-৩

১।

- (ক) যাইত
(খ) করিতেন
(গ) হইয়াছেন
(ঘ) করিত

- (ঙ) বলিয়া
(চ) আসিত
(ছ) শুনিতেন
(জ) দেখিয়া

- (ঝ) যাইতেছে
(ঞ) তাহাদিগের

২।

(ক) ক্ষুদ্র

(খ) বস্ত্র

(গ) শিক্ষায়তন

(ঘ) নিদ্রা

(ঙ) মস্তক

(চ) সাঁঝ

(ছ) বারি

(জ) থালা-বাটি

(ঝ) আহাৰ করা

(ঞ) রাত্রি

৩।

(ক) বিদেশি

(খ) দেশি

(গ) বিদেশি

(ঘ) দেশি

(ঙ) দেশি

(চ) বিদেশি



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

বিএল ২ একক : ৪ ভ্রমণ সাহিত্য - নবনীতা দেবসেন

গঠন

৪.০	উদ্দেশ্য
৪.১	প্রস্তাবনা
৪.২	মূল পাঠ
৪.৩	সারাংশ
৪.৪	সারসংক্ষেপ
৪.৫	নির্বাচিত পাঠ্য
৪.৬	উত্তর সংকেত

৪.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি নবনীতা দেবসেনের

- গদ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।
- ভ্রমণ সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে করতে পারবেন।
- ভ্রমণ কাহিনি সম্পর্কে অবগত হবেন।
- নিখুঁত সাহিত্যভাষা ও রম্যরসের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

৪.১ প্রস্তাবনা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জন্মদিনে' কবিতায় জানিয়েছিলেন-

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—

মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিঁধু মরু,

কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু

রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;

মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে

অক্ষয় উৎসাহে—

যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী

কুড়াইয়া আনি।

জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে

পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে। (জন্মদিনে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সত্যিই তো আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়, বিশাল এই জগতের প্রতিটি জায়গা ঘুরে দেখা।

তাই 'বিপুলা এ-পৃথিবী'কে জানতেই আমরা ভ্রমণ সাহিত্য পড়ি। আর তেমন যদি সাহিত্য হয়,

তা পড়ে ভ্রমণের আনন্দও অনেকটাই মেলে। এখন অবশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর

দৌলতে অনেকেই ইউটিউব অথবা ফেসবুক, ইন্সটাগ্রামে ট্রাভেল ভ্লগ দেখে থাকেন। কিন্তু

একটা সময় ভ্রমণ সাহিত্যই ছিল আমাদের আনন্দের সঙ্গী। সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা

হিসাবে 'ভ্রমণ সাহিত্য' পরিচিতি পেয়েছে অনেক দিনই। বিখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়

বলেছিলেন- 'ভ্রমণ থেকেই হয় ভ্রমণ কাহিনী। কিন্তু ভ্রমণকারীদের সকলের হাত দিয়ে নয়।'

অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি সকলেই ভ্রমণ করলেও ভ্রমণসাহিত্য লিখতে পারা সহজ কাজ নয়।

আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে ভ্রমণ সাহিত্য কী? খুব সহজ করে বলা

যেতে পারে- একটি ভ্রমণ সাহিত্যে থাকে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার বর্ণনা। কিন্তু আদর্শ ভ্রমণ

সাহিত্যে এইরকম বেড়ানোর বর্ণনার পাশাপাশি আরো অনেক বিষয় চমৎকার ভাবে তুলে ধরা

হয়। সঠিক তথ্য থাকে। বেড়ানোর জায়গাটির কথা, পরিবেশের কথা, সেখানকার মানুষজনের

কথা, খাবার, পোশাক সমস্ত কিছুই বিবরণ যথাযথ ভাবে একটি ভ্রমণ সাহিত্যে থাকে। তবে

এ-সব কিছুর উপরে থাকে সাহিত্য রস। বাঙলা ভাষায় প্রথম সার্থক ভ্রমণ সাহিত্য

হিসেবে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪০-১৮৮৯) এর 'পালামৌ' গ্রন্থটি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

লেখক বিহারের ছোট নাগপুরের একটি জঙ্গল ভ্রমণের কাহিনী 'পালামৌ'- তে

লিখেছেন। পৃথিবীর বেশিরভাগ ভাষায় অনেক নামজাদা লেখক ভ্রমণ সাহিত্য লিখেছেন। দেশেবিদেশে আবার এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র ভ্রমণ সাহিত্য লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। দুই বাঙলার অনেক বিশিষ্ট লেখক ভ্রমণ সাহিত্য লিখে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত ভ্রমণ সাহিত্যিক হিসাবে আমরা যাঁদের চিনি, তাঁরা হলেন- সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, মুহাম্মদ আব্দুল হাই, সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, বিনয় মুখোপাধ্যায়, শহীদুল্লাহ কায়সার, পল্লীকবি জসীমউদ্দিন প্রমুখ।

নারীদের ভ্রমণ কাহিনি

বাংলা সাহিত্যে নারী লেখকরা অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণভাবিনী দাস ইংল্যান্ডে যান। তিনি আটবছর ইংল্যান্ডে থাকার সময় অনেক রকম ঘটনার মধ্যে দিয়ে গেছেন। সেইসকল ঘটনা নিয়ে তিনি একটি বই লেখেন। বইটির নাম ‘ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা’। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে লেখাটি বই আকারে প্রকাশ পায়। বাংলা সাহিত্যে নারী লেখকের প্রথম ভ্রমণ সাহিত্য কিন্তু এই বইটি। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আচ্ছা! বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে প্রথম বইয়ের খোঁজ পাচ্ছি। তাহলে কী নিজের দেশ ভ্রমণ করে কোন মহিলা লেখক ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেননি? সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমাদের বুলিতে রয়েছে। আরও অনেকের মতো প্রসন্নময়ী দেবীও ভারত ভ্রমণ নিয়ে প্রথম ‘আর্য্যাবর্তে বঙ্গমহিলা’ নামের একটি বই লেখেন।

উনিশ-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি নারীদের ভ্রমণকাহিনি আমরা পাচ্ছি। সেইসময় আমাদের কন্যারা স্বপ্ন দেখেছেন ভ্রমণের, তবে আজকের মতো সহজ ছিল না তাঁদের পথচলা, একটি জটিলতর সময়ে তাঁরা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করেছেন। অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে উড়াল দিয়েছেন অজানার পথে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, অখ্যাত কোন প্রদেশ থেকে ইউরোপ, নরওয়ে, নেফা, নেপাল, জাপান চষে বেড়িয়েছেন তাঁরা। শিকল ভেঙে, স্বাধীন ভাবে কেউ ‘থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে’ বলে একা বেরিয়েছেন, কেউ বা জীবনসঙ্গীর হাত ধরে। এভাবেই আমাদের পূর্বজারা দেশেবিদেশে ঘুরেছেন। আমাদের উপহার দিয়েছেন নানান ভ্রমণ স্মৃতিকথা। উল্লেখনীয় সাহিত্যিকরা হলেন--স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, শরৎচন্দ্র দেবী, দুর্গাবতী ঘোষ, বিমলা দাশগুপ্তা, রাজলক্ষ্মী দেব্যা, সারদাসুন্দরী দেবী, সৌদামিনী দেবী, গিরীন্দ্রনন্দিনী, হরিপ্রভা তাকেদা, নরেন্দ্র দেব, হেমলতা সরকার, রাণী চন্দ, সুফিয়া কামাল, অমলাশঙ্কর, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ।

আমাদের পাঠ্য নবনীতা দেবসেনের ‘ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে’ বইয়ের কাজিরাজা পর্বটি। নবনীতা দেবসেনের ভ্রমণ সংকলনগুলি পাঠ করলে মনে হয় খুব কাছের বন্ধুর কাছে

বেড়াতে যাওয়ার গল্প শুনছি। সহজ সরল ভাষায় খুব সুন্দর ভাবে তিনি তাঁর বেড়ানোর গল্পগুলি বলেছেন। মাঝে মাঝে মজার মজার কথা বলে পাঠকদের রসের যোগান দেন তিনি। এখন আমরা নবনীতা দেবসেনের কয়েকটি ভ্রমণ সংকলনের সাথে পরিচিত হবো। নবনীতার বাবা ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব। মা-ও ছিলেন সাহিত্যিক। রাধারানী দেবী। একরত্তি বয়স থেকে নবনীতা মা-বাবার সঙ্গে দেশেবিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। একটা সময় ভ্রমণ তাঁর নেশা হয়ে ওঠে। নবনীতা দেবসেনের বাবা নরেন্দ্র দেব ভ্রমণ পিপাসু ছিলেন। ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন তিনিও। রাধারানী দেবীও স্বামীর সঙ্গে বেড়িয়েছেন অনেক। নবনীতা দেবসেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। অধ্যাপনার সূত্রে কোথাও কোনো কাজে গেলেও নবনীতা ব্যাকুল হয়ে উঠতেন বেড়ানোর জন্য। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর রক্তের মধ্যে ভ্রমণপিপাসু পিতার ভ্রমণ-নেশাটি সঞ্চারিত হয়েছে বাল্যাবধি। সেই নেশা আর তাঁর সাহিত্যরস পরিবেশনের অবাক করা ক্ষমতা মিলিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর ভ্রমণসাহিত্যের ভাণ্ডার। তাঁর কয়েকটি ভ্রমণসাহিত্যের বিষয়গুলি এরকম।

করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে

হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল সেমিনারে গিয়ে একবার হঠাৎ নবনীতা সিদ্ধান্ত নেন, এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় যাবেন। লেখকের কুম্ভযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায় ‘করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে’ বইটিতে। সহজ, সাবলীল ভাষায় কুম্ভযাত্রার কাহিনি পাঠকদের মন ছুঁয়ে গেছে। একলা একজন নারী আশ্রমের তাঁবুতে থেকেছেন, সঙ্গমের জলে ভোরবেলায় স্নান করতে গিয়েছেন। প্রয়াত পিতা ও শ্বশুরমশাইকে স্মরণ করে, ডুব দিয়েছেন জলে-- হাতে ভাসমান চটি; এরকম আকর্ষণীয় ঘটনা এই বইতে স্থান পেয়েছে।

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে

মূলত উওরাখণ্ড ভ্রমণের কাহিনি নবনীতা দেবসেন এই বইতে বর্ণনা করেছেন। যমুনোত্রী - গঙ্গেত্রী - বদ্রীনাথ - কদারনাথ- উত্তরকাশী - রুদ্রপ্রয়াগ - কর্ণপ্রয়াগ - নন্দপ্রয়াগ - গৌরীকুম্ভ - যোশীমঠ - হৃষীকেশ - শোনপ্রয়াগ প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানের চিত্র এই বইতে পাওয়া যায়। এই বইটি পাঠ করলে, উওরাখণ্ডের অপরূপ ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থবাস সম্পর্কে পাঠক একটি ধারণা পেয়ে যান। নবনীতা মেয়ে পিকলো ও ভাই রঞ্জনের সঙ্গে উওরাখণ্ড দর্শনে বেরিয়েছিলেন। ছোট ছোট অধ্যায়ে, ছোট ছোট ঘটনা বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক কাহিনি বুনেছেন। বিষয়- বিন্যাস, প্রকৃতি-বর্ণনা, তীক্ষ্ণ রসবোধ, জীবন-দর্শন অসাধারণ ভাবে এই বইতে পরিবেশন করা হয়েছে। বইটিতে লেখকের সহৃদয় অনুভূতির ছবি বারবার ধরা

পড়েছে। লেখার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অতুলনীয় মনোমুগ্ধকর সব বর্ণনা। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে--হিমালয়ের কোলে বর্ষণসিক্ত একটি দিন কাটাবার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা পাঠ করে পাঠক বিহ্বল হতে বাধ্য হবেন।

নানা মহাদেশের মাটি জলস্পর্শ আছে বলে তাঁর পাঠকের ভ্রমণপিপাসু মন রস সংগ্রহ করতে পারবে--'ভ্রমণের নবনীতা' গ্রন্থের ভূমিকায় এমন বলেছিলেন তিনি। ছোট থেকে জলের ধারে একটি বাড়ি থাকবে এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন নবনীতা। কলকাতার ভালো-বাসার বাড়ি থেকে তিনি রবীন্দ্রসরোবর দেখতে পেতেন। দিল্লির মডেল টাউনের বাড়ির সামনে ছিল একটি দ্বীপ। দিল্লিতে হ্রদের উপরে ছোট একটি বাড়িতে বাসা বেঁধেছিলেন। কেম্ব্রিজে বাস করতেন রিভার ভিউ ফ্ল্যাটে। ইতালিতে লেক কেমোর বেলাজিও গ্রামে থাকতেন। আবার যখন তিনি কানাডায় গ্রীষ্মকালীন অধ্যাপনায় যোগ দিতে গেলেন, সেখানে সমুদ্র, পাহাড় ঘেরা একটি জায়গায় থাকার সুযোগ পান। এই বইতে দেখি, জগতের অনেক স্থানে তিনি জলের ধারে বাস করেছেন। এই জলের ধারে ঘর প্রসঙ্গ একাধিক বার এসেছে এই কাহিনিতে। আবার কলকাতার গঙ্গায় সারিসারি নৌকা দেখে মিশরের ফুলদানির ছবির কথা যখন লেখকের মনে পড়ে, তখন পাঠকের মনে বিস্ময় জাগে! একমাত্র নবনীতা পারেন এত সুন্দর ভাবে দেশ-বিদেশের মিলন ঘটাতে। দেশের মাটিতে বসে বিদেশকে অনুভব করার মতো দার্শনিকতা কতো জনের থাকে? এখানেই তিনি অনন্য। এই বর্ণনা থেকে আমরা ভিনদেশের খাদ্য, পানীয় গ্রহণের কথা জানতে পেরেছি, তেমনি প্রকৃতির বিচিত্র রূপের বর্ণনা কী সুন্দর ভাবে তিনি সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন! এই সব ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন নবনীতা নামের একটি দুর্জয় সাহসী, কোমল-কঠোর, বুদ্ধিদীপ্ত, সহৃদয়, সুরসিক নারী। হ্যাঁ, তাঁর সর্ববিষয়জয়ী নারী সত্তার পরিচয়টি বিশেষভাবেই এইসব বর্ণনায় পাঠককে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, “জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ”। ভ্রমণব্যাকুল নবনীতা দেবসেন কথাটি মর্মে-মর্মে অনুধাবন করে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছেন। বলছেন, কবি যতই মহানুভব হন না কেন, আসলে জগতে আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ থাকে না। নবনীতার আছে। তার মূলে তাঁর চঞ্চল মন, সর্বদা ছটফট করে বেড়ানোর প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে তিনি পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন আর তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি অনবরত ভরে তুলেছেন বিচিত্র সব ঘটনায় আর গভীর জীবনবোধে।

বইটির গোড়াতেই আছে এক বয়োজ্যেষ্ঠ বিখ্যাত সাহিত্য-আলোচক বন্ধুর সঙ্গে নবনীতার হঠাৎ-দেখা হওয়ার একটি ঘটনা। লেখিকা দমদম থেকে প্লেনে চেপে গৌহাটি এসে নেমেছেন। মেয়েদের একটি সাহিত্যসভায় যাবেন জোড়হাটে। মাঝে গৌহাটিতে একটু বিশ্রাম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ব্যস! মশগুল-আনন্দ আর গল্পে মজে গিয়ে

গৌহাটি বিমানবন্দরে জোড়হাটের বদলে দমদমের বিমানে চেপে বসলেন তাঁরা। পাশের সহযাত্রীরা কথোপকথনে বুঝে গিয়েছিলেন, এঁরা জোড়হাটে যাবেন। তাই আকস্মিকভাবে ওঁদের আড্ডা থামিয়ে জানালেন, বর্তমান প্লেনটির গন্তব্যের কথা। আর তারপরেই দুই অসমবয়সী বন্ধুর দৌড়ের প্রতিযোগিতা! নবনীতা জানাচ্ছেন, বয়স হলেও দেখা গেল আশুবারু ভালোই দৌড়তে পারেন! অদূরে দাঁড়ানো আদুরে বেড়ালছানার মতো গরগর করতে থাকা জোড়হাটের প্লেনটিকে “অ্যাইও, অ্যাইও” করে হাত দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে ফেললেন দুই সাহিত্যিক। তার পরে নিশ্চিন্তি! চেপে বসলেন তাঁরা জোড়হাটের বিমানে। এর পর তাঁর কাজিরাজা বেড়ানোর গল্প।

ট্রিকবাহনে ম্যাকমাহনে

আসলে ১৯৭৭ সালে আসামের জোড়হাটে নবনীতা দেবসেন মহিলা সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন। সাহিত্যসভা হোক আর যা-ই হোক, নবনীতা বেড়ানোর সুযোগ ছাড়তেন না কখনো। কেবলমাত্র নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সেবারকার সেই আলোচনাসভাতে গিয়ে হঠাৎ কাজিরাজা ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে গেলেন তিনি। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় নবনীতা এই অপরিকল্পিত ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে একেবারে আগ্রহ হয়ে পড়লেন। এবারের যাত্রায় তিনি ট্রিকে চেপেই তিব্বত সীমান্ত অবধি ঘুরে এসেছিলেন। ট্রিকে চেপে ভ্রমণের অনবদ্য কাহিনি এই ভ্রমণ আখ্যানে স্থান পেয়েছে। একবার কোন জায়গায় যাবার কথা ভাবলে নবনীতা সেই জায়গাটি দেখেই ছাড়তেন। প্রবল মনোবল, জেদকে সঙ্গী করে তিনি একাধিক বন্ধুর ও দুর্গম স্থানে গিয়েছেন। কারো কথা শোনেন নি। অল্প বয়সে তিনি একা এবং কখনো-কখনো বন্ধুদের সঙ্গে সারা ভারত ও শ্রীলঙ্কা ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাসে ভরা ভ্রমণ কাহিনিগুলি বারবার পাঠকদের মন ছুঁয়েছে। মহিলা সাহিত্য সভা শেষ হলে তিনি কাজিরাজা অরণ্য ভ্রমণে যান। তারপর সেখান থেকে তিনি পাড়ি দিলেন তেজপুরে, সাহিত্য সভার আয়োজকদের আমন্ত্রণে। তেজপুরে তিনি স্টিমারে চেপে যাচ্ছিলেন। সেখানে এক সহযাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হন যাঁর গন্তব্য স্থান ছিল বমডিলা। ১৯৬২ সালে চিনের সৈন্যরা যুদ্ধের সময় এই বমডিলা দিয়ে লাসা-তাওয়াং রোড ধরে অনুপ্রবেশ করেছিল। এই কথা শোনার পর লেখক তাওয়াং যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেই জায়গাটি তখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দখলে ছিল, তদুপরি যাত্রাপথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম, যানবাহনের ব্যবস্থাও ছিল না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মানুষ সেই স্থানে যাবার অনুমতি পেতেন না। লেখকের বন্ধুবান্ধবরা তাওয়াং যাবার কথা শুনে চমকে ওঠেন। তাওয়াং যাবার জন্য স্পেশ্যাল পারমিট জোগাড় করতে হবে যে! তখন সহজে পারমিট পাওয়া যেতো না। পারমিট জোগাড় করা খুবই ঝামেলার কাজ ছিল। তাই সকলেই লেখককে তাওয়াং যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু লেখকের জেদের কাছে সকলকে নিরস্ত হতে হয়। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে শেষ পর্যন্ত হাঁস, মুরগির সঙ্গে ট্রিকে চড়ে তিনি তাওয়াং যাত্রা

করেন। সে এক অবিস্মরণীয় গল্প। যাত্রাপথে অনেক রকম অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে একদিন গভীর রাতে লেখক তাওয়াং পৌঁছেও যান। ঘন কুয়াশা ঘেরা রাত্রে লেখক জানতেন না কোথায় থাকবেন, কী খাবেন। সেইখানে আকস্মিক ভাবে পথে আলাপ হয় একজন ডাক্তারের সঙ্গে। সেই ডাক্তারের বাড়িতে তিনি অতিথি হয়ে যান।

অপূর্ব তাওয়াং দেখে লেখক মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সেখানে গিয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাঁদের সঙ্গী করে তিনি সেই স্থান ঘুরে দেখেন। বিশ্ব বিখ্যাত তাওয়াং মনাস্টারি দেখেন, এবং লাসা-তাওয়াং রোড পর্যন্ত ঘুরে আসেন। লাসা-তাওয়াং-এর উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল বিখ্যাত ম্যাকমাহন লাইন। ম্যাকমাহন লাইনটি তাওয়াং বর্ডার সাব-ডিভিশনে, ৪০০০-১৯০০০ ফুট অলটিচ্যুডের মধ্যে অবস্থিত। এই ম্যাকমাহন লাইন পর্যন্ত যাবার জন্য বিশেষ অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয়। নবনীতার কাছে ম্যাকমাহন যাবার জন্য বিশেষ অনুমতি পত্র না থাকায়, তিনি সে পর্যন্ত যেতে পারেন নি।

তিব্বতি উপজাতি মোম্পাদের গ্রামে থেকে তাদের জীবনযাত্রা দেখে নবনীতা মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এতো সহজ, সরল মানুষের জীবন দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। ভাষাগত সমস্যা ছিল ঠিকই, কিন্তু ভাষার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে লেখকের মনের মিল হয়ে গিয়েছিল। তিব্বতি চা, তিব্বতি ফিল্টার বিয়ার সিংছাং, পানীয় পান করে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন লেখিকা। অতঃপর তিনদিন তিব্বতের একটি ছোট গ্রামে কাটিয়ে নতুন বন্ধুদের ভালোবাসাকে সঙ্গী করে লেখক ঘরে ফেরার পথ ধরেন। হিমালয়ের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম নবনীতা দেবসেনের বর্ণনায় পাঠকদের কাছে অতি আপন হয়ে ওঠে।

উত্তমাশা অন্তরীপ এবং

ভ্রমণ সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি শহর ডারবান, জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া ও কেপটাউন ঘোরার বিস্তারিত কাহিনিও রয়েছে। চমৎকার ভাবে লেখক অতীতের ঘটনা উল্লেখ করে, এই কাহিনিকেও জীবন্ত করে তুলেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছে গান্ধীজির স্মৃতি বিজড়িত অঞ্চল গুলি ঘুরে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। পিটার মারিতসবার্গস স্টেশনে মহাত্মা গান্ধীকে চরম অপমান করা হয়েছিল বাদামী চামড়ার জন্য। গান্ধীজির কাছে ফাস্ট ক্লাস টিকিট ছিল, তবুও তাঁকে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়। এছাড়া নেলসন ম্যান্ডেলা কারাবাসে যেখানে থাকতেন সেই স্থান দর্শন, নোবেল বিজয়ী নাদিম গার্ডিমার বাড়িতে চা খাওয়া, অন্তরীপ দেখার মতো স্মরণীয় ঘটনার মতো অসংখ্য কাহিনী এই বইতে স্থান পেয়েছে। ডারবান ডাইরিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। জোহানেসবার্গে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার ফলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘোরার সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। উইটস ইউনিভার্সিটিতে অমর্ত্য সেন ও নাদিম গার্ডিমার বক্তব্য শুনতে যান। সাউথ ওয়েস্টার্ন

টাইনশিপের সোনার খনিতে বেড়াতে গিয়ে সোফিসোর সঙ্গে আলাপ হয় নবনীতার। সোফিসোর ঘটনার কথা পাঠ করে পাঠক আমাদের দেশের ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পান। সোফিসো নামের মানে ‘উইশ’। তাঁর বড় বোনের নাম ডার্লিং, মেজ বোনের নাম হ্যাপি। তাঁদের বাবা মা ভেবেছিলেন তৃতীয়বার নিশ্চয় ছেলে হবে। কিন্তু সে বারও মেয়ে জন্মায়। তাই তাঁর নাম রাখা হয় ‘ইনাফ’। সোফিসোর জন্মের পর তাঁর বাবা-মা আনন্দিত হন। আমাদের দেশের মতো সেখানেও পুত্র সন্তানের কদর বেশি। এরপরে তিনি ঘুরতে যান নেলসন ম্যান্ডেলা, উইনি ম্যান্ডেলা, বিশপ ডেসমন্ড টুটুর বাড়িতে। সেই দেশে গিয়ে নবনীতা আবিষ্কার করেন, জমি নিয়ে মানুষ-মানুষের সঙ্গে ঝামেলা করছে। জাতিভেদ, মানবাধিকার থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার মতো বিষয় গুলি নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। নবনীতা খুব সুন্দর ভাবে সেই দেশের কৃষ্টি-কালচার তাঁর লেখায় পেশ করেছেন। সেখানেও অনেক অজানা তথ্য আছে। আমরা জানতে পারি, লেখিকা আফ্রিকান জ্যাজ সঙ্গীতের ভক্ত। আবার নোবেল বিজয়ীদের নৈশ আহ্বারে গিয়ে তিনি আফ্রিকান যে সকল খাবারের উল্লেখ করেছেন, সত্যি আমাদের কাছে তা অকল্পনীয়। কুমিরের মাংস ভাজা, উটপাখির বড়া, বিনুকের মাংসের চাটনি, আফ্রিকান মশলা দিয়ে খিচুড়ি। এরকম অনেক মজার ঘটনার উল্লেখ ‘উত্তমাশা অন্তরীপ এবং’ বইতে পাওয়া যায়। তবে আমরা আমাদের মূল পাঠটি নিবদ্ধ রেখেছি ‘ভ্রমণের নবনীতা’ বইএর দ্বিতীয় খণ্ডের ‘দ্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে’ নামক ভ্রমণকাহিনির কাজিরাজা পর্বে। অন্য কথা অন্য সময়ে বলা যাবে সুযোগ মতো।

৪.৩ মূলপাঠ : কাজিরাজা পর্ব

ফুকনদের গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিল বন-আপিসে, সেখান থেকে গাইড নিয়ে রওনা। প্রথমে নদী পার হতে হবে। একটা ডিঙি বাঁধা আছে। আমাদের গাইড সেটি চালিয়ে ওপারে নিয়ে গেল। অবশ্য একটা বাচ্চা ছেলে এল নৌকোয়। সে-ই ফেরৎ নিয়ে যাবে ডিঙিটা। আমরা নেমে যেতেই নৌকো ফিরে গেল। এখন কেবল বনজঙ্গল। মিতা, আমি আর বাবরালি। বাবরালির বয়স বেশি নয়, বেশ হাসিখুশি দেখতে। নদীর পাড়টা খাড়াই। আমাদের হাত ধরে টেনে ওপরে তুলে নিলে সে। একটুখানি এগিয়ে খুব উঁচু উঁচু গাছের ঘন সবুজ বন, কত লতায় জড়ানো ঝোপঝাড়, ঠিক ‘ট্রপিকাল ফরেস্ট’ বলতে যা ভাবি, তেমনি। কিন্তু সেটা পুরো কাজিরাজা নয়। যা দেখলুম ঐ একটু ঐরকম। বাকীটা দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা জলাজমি। ঘন বনের মধ্যে একটুখানি ঘাস-জমি পরিষ্কার করা। সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, কে?

মানসিং। মানসিং এক বিশাল বপু দাঁতাল হাতী। একটা দাঁত নেই অবশ্য। একটা মই এনে বাবরালি লাগিয়ে দিল মানসিংয়ের পিঠে। সেই মই বেয়ে উঠে পড়লুম অর্ঘ্যা আর আমি। বাবরালি মাহুত। অর্থাৎ এই বনবিহারে সেই আমাদের ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড। বয়স ত্রিশের মধ্যেই মনে হল, হাসিখুশি ছেলেটি, অর্ঘ্যা ওকে চেনে। বাঁধাধরা মাত্র কয়েকজনই মাহুত আছে বনবিভাগের। শ্রীল শ্রীযুক্ত মানসিং উঠে দাঁড়াতেই দেখলুম, বাঃ! উঁচু উঁচু গাছের ডালপালা সব আমার হাতের নাগালে চলে এসেছে। এই বনের সবুজটা কেমন যেন অন্যরকম, কাঁচা রং। যেন গায়ে ঘষলে, হাতে উঠে আসবে।

মানসিং সত্যিই মাননীয় খুবই উঁচু হাতি। ধৃতির কাছে আসামের নানাবিধ হাতির জাতিপ্রকৃতি বিষয়ে বছর দশেক আগে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলুম। কালার ট্রান্সপেরিসি সমেত লেকচার দিয়ে বন্ধুদের হাতিবিশারদ করবার চেষ্টা করেছিলেন ধৃতিকান্ত, কিন্তু এখন কার্যকালে দেখলুম সব ভুলে গেছি। কী এর পিঠের গড়ন? কিবা এর পায়ের ধরণ? দাঁতের কায়দা? কপাল? লেজ? খুব চেষ্টা করেও মনে পড়ল না। পড়লে, মাহুতকে একটু ইমপ্রেস করা যেত। হলনা। মাহুতই আমাদের ইমপ্রেস করতে শুরু করল। এ বন হচ্ছে তার আজন্ম অধীত শাস্ত্র। এ বিষয়ে অসীমজ্ঞান দেবার ক্ষমতা সে রাখে। হেন প্রশ্ন আমি করতে পারিনি যার উত্তর সে জানেনা। অবশ্য গুল্ তাপ্পিও মেরে থাকলে মারতেই পারে, আমি তো ধরতে পারবোনা সত্যি না মিথ্যে! তবে আজন্ম এই বনে-জঙ্গলে বড় হয়েছে বাবরালি, তার বাপ-খুড়োও মাহুত। হাতি নিয়েই তার জীবন, বন নিয়েই তার বাঁচা। গুলমারার দরকার নেই তার। প্রশ্ন করে তার ভাঁড়ার খালি করতে পারি এমন শক্তি আমারই বরং নেই।

আস্তে আস্তে হাতি বন দিয়ে চলল। দুলতে দুলতে ছোট ছোট ডাল- পালা ভাঙতে ভাঙতে, চিবোতে চিবোতে ছোটখাটো লতাপাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে। এটা চিড়িয়াখানাতে 'ফুলমালার' পিঠে চড়া নয়। জঙ্গল প্রথমে ঘন, এবং তারপরে হঠাৎ পাতলা হয়ে গেল। এবার আর অরণ্য নয়, জলজঙ্গল, বা জংলাজলা। এত দীর্ঘ ঘাস আমি কোনোদিন দেখিনি। মানসিং- এর ঘাড়- মাথার কেবল ওপরটুকুই বেরিয়ে আছে, বাকীটা এই দীর্ঘ অতিদীর্ঘ, দানবীয় তৃণগুল্মে ঢাকা। আমেরিকান প্রেয়ারীজ আমি দেখিনি, তবে এইরকম ঘাসজমিই হবে বোধহয়। এ ঘাস নামেই ঘাস। দেখেছি ফ্রান্সে এই ধরনের ঘাসবনে রেজিস্ট্রারের সময়ে সৈন্যরা লুকিয়ে থাকতো বলে সে ঘাসবনের নামই পাল্টে গেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে কামার্গ অঞ্চলের মাইলের পর মাইল খোলা ঘাসজমিতে গেছি। সেও জংলা- জলা অঞ্চল। কিন্তু সে- ঘাস, আর এ- ঘাস! সেখানেও খুরের ঘায়ে জলছুটিয়ে কেশর উড়িয়ে ছুটে যায় ধবধবে শাদা বুনো-ঘোড়ার দল, কিন্তু অন্য জিনিস এখানে, বুনো হরিণের ছুটে যাওয়া!

সেখানে খট খটে চাঁদিফাটানো, আগুন ঝরানো, মরুভূমির মতো রোদ্দুর। এখানে মেঘের ডাক, আকাশ অন্ধকার।

দু' এক ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। সেখানে ছিল খোলা জীপ আর মানুষের তৈরী রাস্তা। এখানে মোটে পথই নেই। পায়ে পায়েই আপন পথ কেটে নিয়েছে বন্য জন্তুরা। মানসিং তার চেনা হাতী-চলা রাস্তা দিয়ে চলেছে নিশ্চয়, কিন্তু সামনে বা পিছনে সে-রাস্তার দৃশ্যত কোনো চিহ্ন নেই আমাদের চোখে।--

- "বর্ষা বাদল শুরু হবে। আপনাদের ছাতি নেই। দিদিমণিরা কিছু দেখতেও পাবেন না। ভিজেও যাবেন" বাবরালি বলল।- "তার চেয়ে এই একটু হাতীর পিঠে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে ফিরে চলুন, আজ আর জন্তুরা বেরবে না।"

- "বেরবে না মানে? এখানে তো গুহাটুহা দেখছি না? লুকোবে কোথায়?"

- "মানে বৃষ্টির মধ্যে ভাল দেখা যাবেনা দূরের জিনিস। বেশি জীবজন্তু বৃষ্টিতে ভিজে জল খেতেও যাবেনা। পাখীরাও উড়ে বেড়াবেনা। বাঁদররাও ছটোপাটি করবে না।"

- "না করুক। মোটেই ফিরবনা। তিনঘণ্টা ধরে বন দেখবার কথা। তিনঘণ্টাই ঘুরব আমরা বনে বনে।"

- "ভিজে ভিজে?"

- "তা বৃষ্টি হলে কী করব? ভিজে ভিজেই।"

- "এই নিন, তাহ'লে আমার ছাতিটা নিন, আমার ছাতি লাগেনা।"

কিন্তু যে বৃষ্টিটা শুরু হ'ল, তার ছাঁটের কাছে ছাতি এবং হাতি সবই তুচ্ছ। (বানান অপরিবর্তিত)

8.8 সারাংশ

শীলা বরঠাকুর নবনীতা দেবসেনকে সাহিত্য সভাতে যোগদানের জন্য ফোন করেন। কাজিরাস্তা জঙ্গল না দেখালে সভা করতে যাবেন না-- এই কথা নবনীতা দেবসেন শীলা বরঠাকুরকে বলেছিলেন। সভাতে যোগ দেবার পর নবনীতা কাজিরাস্তা যান। শীলা, নবনীতাকে

তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কাজিরাস্কা পাঠান। তাঁরা নবনীতার থাকার জন্য ‘কামরূপ কমপ্লেক্স’ নামের একটি কুটিরের ব্যবস্থা করেছিলেন। নবনীতা সেই কুটির পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। নদীর পারে অসাধারণ ছোটো একটি আশ্রয়। এক্স জার্নালিস্ট শ্রী জগদীশ ফুকন সেই কমপ্লেক্সের মালিক ছিলেন। কাজিরাস্কা জঙ্গল দেখতে যাবার দিন ফুকনদের গাড়ি বন-আপিস অবধি নবনীতাদের পৌঁছে দেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। প্রথমে তাদের একটি নদী পেরতে হয়। গাইড ডিঙি চালিয়ে তাদের ওপারে নিয়ে যান। কাজিরাস্কার জঙ্গলে নবনীতার আলাপ হয় মাহুত বাবরালি ও মানসিংহের সঙ্গে। বিশাল বপু হাতির নাম মানসিংহ। হাতির পিঠে চড়ে রোমাঞ্চকর জঙ্গল দর্শনের কথা নিয়ে কাজিরাস্কা পর্বে উঠে এসেছে। ঘন জঙ্গল হঠাৎ একটা সময় পাতলা হয়ে যায়। এই জঙ্গলে লেখক দীর্ঘ ঘাস দেখেন। উনি জানান এত বড়ো ঘাস তিনি আগে কখনো দেখেন নি। বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছিলেন, আমেরিকার প্রেয়ারীজ তাঁর অদেখা, সেখানে হয়তো এইরকম বড়ো এবং লম্বা ঘাসজমি রয়েছে ! কাজিরাস্কার জঙ্গলে তাঁরা কোন বন্য জন্তু দেখতে পাননি। তিন ঘণ্টা ধরে বন দেখবার কথা ছিল। সহসা বৃষ্টি শুরু হওয়াতে তাঁদের জঙ্গল যাত্রার ইতি ঘটে।

৪.৫ সারসংক্ষেপ

আসামের জোড়হাটে একটি মহিলা সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে কাজিরাস্কা জঙ্গল দেখতে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নবনীতা। কাজিরাস্কা পর্বে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল ভ্রমণের অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে। কাজিরাস্কা জঙ্গলের ঘটনা লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কাজিরাস্কা পর্ব পাঠ করে জঙ্গলের একজন সাধারণ মাহুত, হাতির জীবনযাপন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়। লেখক মজার মোড়কে কাজিরাস্কা পর্বের কাহিনি অনবদ্য ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

অনুশীলনী

নিচের প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পাতায় উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১.নিচের দেওয়া বিবৃতি গুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক. ফুকনদের গাড়ি লেখকদের নদীতে নামিয়ে দিল। ☐ ঠিক ☐ ভুল

খ. লেখকদের প্রথমে নদী পার হতে হবে। ☐ ☐

গ. একটা ডিঙি খোলা আছে। ☐ ☐

ঘ. ছুটতে ছুটতে হাতি বন দিয়ে চলল। ☐ ☐

ঙ. হাতির নাম বাবরালি। ☐ ☐

চ. হাতি নিয়েই বাবরালির জীবন, বন নিয়েই তার বাঁচা। ☐ ☐

ছ. বনবিভাগে অনেক মাহুত আছে। ☐ ☐

জ. মানসিং একটি দাঁতাল হাতি। ☐ ☐

ঝ. 'ফুলমালা' একটি বন্য শূকর। ☐ ☐

ঞ. লেখক আমেরিকান প্রেয়ারীজ দেখেছিলেন। ☐ ☐

ট. মাহুত লেখকদের ইমপ্রেস করেছিলেন। ☐ ☐

২. বিবৃতিগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক তার ডান পাশের ঘরে টিক চিহ্ন ✓ দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) ফুকনদের গাড়ি লেখকদের নামিয়ে দিয়েছিল

গভীর জংগলে ☐
নদীর ধারে ☐
বন-আপিসে ☐
রাস্তার মাঝে ☐

খ) হাতি বন দিয়ে চলল
দ্রুত গতিতে ☐
ধীর গতিতে ☐
মাঝারি গতিতে ☐
দম নিতে নিতে ☐

গ) বাবরালি কে ছিলেন?

বন্ধু ☐
মাহুত ☐
হাতি ☐
অফিসার ☐

ঘ) বাবরালির বয়স

কুড়ির মধ্যে ☐
ত্রিশের মধ্যে ☐
চল্লিশের মধ্যে ☐
পঞ্চাশের মধ্যে ☐

ঙ) মই বেয়ে হাতির পিঠে উঠলেন

লেখক ও ধৃতিকান্ত ☐
লেখক ও অর্ঘ্যা ☐
লেখক ও মানসিং ☐
লেখক ও বাবরালি ☐

চ) হাতির নাম

বাবরালি ☐

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

মানসিং ☐
অর্থ্যা ☐
ধৃতি ☐

ছ) কাজিরাস্তা অবস্থিত

নেপালে ☐
আসামে ☐
ভুটানে ☐
মধ্যপ্রদেশে ☐

জ) বনবিভাগে মাহুত রয়েছেন?

অনেকজন ☐
কয়েকজন ☐
দশজন ☐
ছয়জন ☐

৩. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) সেখানে খটখটে ----- , আগুন বারানো, ----- মতো রোদ্দুর।

খ) আস্তে আস্তে ----- বন দিয়ে চলল। দুলতে দুলতে ----- ডাল- পালা ভাঙতে ভাঙতে, চিবোতে চিবোতে ছোটখাটো লতাপাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে।

গ) অর্থাৎ এই ----- সেই আমাদের ফ্রেন্ড, ----- অ্যাণ্ড গাইড।

ঘ) আমরা নেমে যেতেই ----- ফিরে গেল। এখন কেবল ----- । ----- , আমি আর বাবরালি।

ঙ) প্রশ্ন করে তার ----- খালি করতে পারি এমন ----- আমারই বরং নেই।

চ) হাতি নিয়েই তার ----- , বন নিয়েই তার ----- ।

ছ) ----- 'এক ফোঁটা ----- পড়তে শুরু করেছে।

জ) তিনঘণ্টা ধরে ----- দেখবার কথা। ----- ঘুরব আমরা বনে বনে।

ঝ) কালার ট্রান্সপেরিসিসমেত_____ দিয়ে বন্ধুদের_____ করবার চেষ্টা করেছিলেন
ধৃতিকান্ত, কিন্তু এখন কার্যকালে দেখলুম সব_____ গেছি।

ঞ) দেখেছি ফ্রান্সে এই ধরনের_____ রেজিস্ট্রার্সের সময়ে সৈন্যরা লুকিয়ে থাকতো বলে
সে ঘাসবনের নামই_____ গেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে কামার্গ অঞ্চলের মাইলের পর_____ খোলা
ঘাসজমিতে গেছি।

ট) সেও জংলা-_____ অঞ্চল।

ভাষাদক্ষতা বিষয়ক

৪ . নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন

ক) কাঁচা

খ) হাসি

গ) উঁচু

ঘ) ঘন

ঙ) ছোট

চ) সত্যি

ছ) জীবন

জ) জল

ঝ) সাদা

ঞ) বৃষ্টি

৫) নিম্নলিখিত 'চলিত' শব্দ গুলি 'সাধু' শব্দে রূপান্তরিত করুন ।

ক) দেখবার

খ) পড়তে

গ) রয়েছেন

ঘ) করেছে

ঙ) ধরে

চ) চললো

ছ) লুকিয়ে

- জ) চালিয়ে
ঝ) টেনে
ঞ) ফিরবোনা

৬) নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখুন

- ক) নদী
খ) হাতি
গ) বাপ
ঘ) বৃষ্টি
ঙ) ছোট
চ) ঘোড়া
ছ) আগুন
জ) অন্ধকার
ঝ) জল
ঞ) বন

৭। নিচের প্রদত্ত শব্দগুলির মধ্যে কোনটি দেশি ও কোনটি বিদেশি বাছাই করে ডানদিকের ঘরে টিক ✓ চিহ্ন দিন।

	দেশি	বিদেশি
ক) পিতা	☐	☐
খ) জল	☐	☐
গ) ফ্রেন্ড	☐	☐
ঘ) নদী	☐	☐

ঙ) ফিলসফার	☐	☐
চ) আপিস	☐	☐
ছ) আকাশ	☐	☐
জ) গাইড	☐	☐
ঝ) বন	☐	☐
ঞ) রেজিস্ট্রার	☐	☐

৮। একটি মনোরম ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় কোন কোন বিষয়ের প্রতি নজর রাখা উচিত?
নিজের ভাষায় লিখুন।

৯। আপনার নিজের একটি ভ্রমণ কাহিনির অভিজ্ঞতা জানিয়ে নিবন্ধ লিখুন।

৪.৬ নির্বাচিত পাঠ্য

কাজিরাজা পর্ব : নবনীতা দেবসেন

৪.৭ উত্তর সংকেত

১।

ক) ভুল

খ) ঠিক

গ) ভুল

- ঘ) ভুল
- ঙ) ভুল
- চ) ঠিক
- ছ) ভুল
- জ) ঠিক
- ঝ) ভুল
- ঞ) ঠিক
- ট) ঠিক

২।

- ক) বন-আপিসে
- খ) ধীর গতিতে
- গ) মাল্হত
- ঘ) ত্রিশের মধ্যে
- ঙ) লেখক ও অর্থ্যা
- চ) মানসিং
- ছ) আসামে
- জ) কয়েকজন

৩।

- ক) চাঁদিফাটানো, মরুভূমির
- খ) হাতি, ছোট ছোট
- গ) বনবিহারে, ফিলসফার
- ঘ) নৌকো, বনজঙ্গল, মিতা
- ঙ) ভাঁড়ার, শক্তি
- চ) জীবন, বাঁচা
- ছ) দু, জল
- জ) বন, তিনঘণ্টাই
- ঝ) লেকচার, হাতিবিশারদ, ভুলে
- ঞ) ঘাসবনে, পাল্টে, মাইল

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ট) জলা

৪।

ক) পাকা

খ) কান্না

গ) নিচু

ঘ) পাতলা

ঙ) বড়

চ) মিথ্যে

ছ) মরণ

জ) স্থল

ঝ) কালো

ঞ) রোদ

৫।

ক) দেখিবার

খ) পড়িতে

গ) রহিয়াছেন

ঘ) করিয়াছে

ঙ) ধরিয়া

চ) চলিলো

ছ) লুকাইয়া

জ) চালাইয়া

ঝ) টানিয়া

ঞ) ফিরিবোনা

৬।

ক) স্রোতস্বিনী, তটিনী

খ) হস্তি, গজ

গ) জনক, পিতা

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

- ঘ) বারিধারা, বাদল
- ঙ) হীন, সংকীর্ণ
- চ) অশ্ব, তুরঙ্গ
- ছ) অগ্নি, অনল
- জ) আঁধার, তিমির
- ঝ) বারি, সলিল
- ঞ) অরণ্য, বনানী

৭।

- ক) দেশি
- খ) দেশি
- গ) বিদেশি
- ঘ) বিদেশি
- ঙ) বিদেশি
- চ) বিদেশি
- ছ) দেশি
- জ) বিদেশি
- ঝ) দেশি
- ঞ) বিদেশি

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

৮। কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে সব থেকে বেশি আনন্দদায়ক যে ঘটনাগুলো ঘটবে সেই ঘটনাগুলিকে ভ্রমণ কাহিনিতে স্থান দিতে হবে। মনোরম ভ্রমণ কাহিনি লিখতে গেলে আমাদের যে বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে সেগুলি হল-

ক) দীর্ঘ ভ্রমণে নানান অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে। বিরক্তিকর ঘটনা পাঠে পাঠক বিরক্ত হবেন তাই আনন্দদায়ক, মজার কাহিনি লিখতে হবে। নিজেকেই সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ভ্রমণের কোন ঘটনা কাহিনিতে স্থান পাবে।

খ) পাঠকের মনযোগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রথম পরিচ্ছেদে কোন চমকদার ঘটনা দিয়ে গল্প শুরু করা যেতে পারে, অথবা রহস্য, নাটকীয় ঘটনা, মজার অভিজ্ঞতা জানিয়ে কাহিনির সূত্রপাত হতে পারে। মাথায় রাখতে হবে প্রথম পরিচ্ছেদ এমন ভাবে লিখতে হবে, যাতে পাঠক আকৃষ্ট হন।

গ) ভ্রমণ সঙ্গীদের সঙ্গে কথোপকথন ভ্রমণ কাহিনিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ভ্রমণ সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ, স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব, কথোপকথনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, প্রাকৃতিক শোভা ভ্রমণ কাহিনিতে যথাযথ ভাবে যোগ করতে হবে।

ঘ) ঘটনা মজাদার ভাবে উপস্থাপন করলে পাঠকরা আনন্দ পাবেন, প্রাণ খুলে হাসবেন তাই ভ্রমণ কাহিনি লঘুরসের সঙ্গে উপস্থাপন করা শ্রেয়।

ঙ) সহজ সরল ভাষায় ভ্রমণ কাহিনি লিখতে হবে। সহজ, সাবলীল ভাষায় কোন কাহিনি বর্ণনা করলে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়। অনর্থক জটিল ভাষা, কঠিন বাক্যগঠন পাঠকের বোধগম্য না হলে, কাহিনির ছন্দপতন ঘটবে। সেইজন্য এমন ভাবে কাহিনি উপস্থাপন করতে হবে পাঠকের চোখে যেন সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। সত্যিকার অর্থে পাঠক যেন মানস ভ্রমণ করতে পারেন।

চ) প্রত্যেক পরিচ্ছেদে বেড়ানোর বিস্তারিত বর্ণনা, পথ নির্দেশ, পরবর্তী গন্তব্যস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দিতে হবে।

ছ) কাহিনি দ্রুত শেষ করে দিলে পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন, কাহিনির সঙ্গে একাত্ম বোধ করবেন না। তাই অতি যত্ন সহকারে, সময় নিয়ে কাহিনির সমাপ্তি টানতে হবে।

৯। ভ্রমণ কাহিনি:

প্রতিদিনের বিরক্তিকর একঘেয়ে জীবন আমাদের ভালো লাগে না। তাই বিরতি নিয়ে আমরা মাঝেমধ্যে প্রকৃতির কাছে ছুটে যাই। বাঙালির পায়ের তলায় সরষে, সেইজন্য সে জোরসে ঘুরে বেড়ায়। ভ্রমণপিপাসু জাতি হিসাবে বাঙালি পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ অদেখাকে দেখার উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন। ঠিক কোন সময় থেকে ভ্রমণের মাদকতা বাঙালিকে মাতাল করলো, বলা মুশকিল! তবে একসময় তীর্থস্থান পরিদর্শন করতে দলবল নিয়ে বঙ্গসন্তানরা

পাড়ি দিতেন-পুরী,প্রয়াগ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন। সেই বাঙালি বলেই আমরা আমাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারিনি। প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণে হেথায়, হোথায় ঘুরে বেড়াই। ভ্রমণের নেশায় অনেক জায়গায় ছুটে যাই। তবে সেই ছোট থেকেই আমার পাহাড় খুব প্রিয়। তাই, বারবার পাহাড়ের কাছে ছুটে যাই! পাহাড়ের অমায়িক, উদার সংস্পর্শে মন ভালো হয়ে যায়। তাদের মতো আপন করে নেবার ক্ষমতা আমাদের সমতলের মানুষদের নেই।

আমরা বন্ধুরা মিলে সেবার গিয়েছিলুম হিমাচল প্রদেশের ক্ষীরগঙ্গা ট্রেকিং করতে। দুর্গম পথে আমরা কখনো মনের আনন্দে, কখন অজানা ভয়ে চড়াই উतरাই পার করে আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছেছিলাম। আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম দিল্লি থেকে। প্রথমে আমরা কাসোল পৌঁছাই। সেখান থেকে যাই তোস গ্রামে। এইখানে অনেক ইসরায়েলি পর্যটকদের দেখা যায়। হঠাৎ ইসরায়েলি পর্যটকের কথা কেন বললাম? এই পর্যায়ে একটু রহস্য থাকুক! কাহিনির শেষে এই বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে।

আমরা একদিন তোসে থাকার পর, পরের দিন রওনা হই ক্ষীরগঙ্গার উদ্দেশ্যে।

ক্ষীরগঙ্গার উচ্চতা ৯৭০০ ফুট। হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় ক্ষীরগঙ্গা অবস্থিত। আমাদের ট্রেকিং শুরু হয়েছিল বার্সাইনি গ্রাম থেকে। ওখানে হাইডেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ হচ্ছে দেখলাম। ক্ষীরগঙ্গা পৌঁছানোর জন্য বার্সাইনি থেকে দুটি পথ আছে। একটি কালগা গ্রামের মধ্যে দিয়ে, অপরটি শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে। কালগা গ্রামের পথটি ছোট এবং বিপদজনক ছিল। সেইজন্য আমরা শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে যাত্রা শুরু করি। এই রাস্তাটি সামান্য এবড়ো খেবড়ো ছিল। তবে সব ভয়কে সিন্দুকে বন্ধ করে-‘আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ’ গান গাইতে গাইতে আমরা এগিয়ে চললাম। তখন তো আর জানতাম না, কী বিপদ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য! কিছুক্ষণ পর আমরা দেখতে পেলাম কয়েকজন শিশু আমাদের পাশে হাঁটছে। গ্রাম্য নারীরা মাথায় বোঝা নিয়ে অনায়াসে পাহাড়ে উঠছে। তাঁদের দেখে হঠাৎ মনে হয় আধুনিক জীবনের দুর্ভোগ জটিলতা এঁদের স্পর্শ করতে পারেনি! এত সহজ জীবন! এরপরে আমরা একটি ছোট গ্রামে প্রবেশ করলাম। সেই গ্রামে আমরা বাচ্চাদের খেলতে দেখলাম। পাহাড়ি ঠাকুমা অতি মমতায় নাতনিকে তেল মাখাচ্ছেন, গ্রামের মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করছেন।

অনেকে গবাদি পশুর জন্য ঘাস কাটছেন। গ্রামের একটি দোকানের সামনে আমরা কিছুক্ষণ বিরতি নেবার জন্য থামলাম। সেইসময় অনেকগুলি পাহাড়ি শিশু এসে আমাদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করল, তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল লজেন্স খাওয়া। সাধারণত প্রায় সব পাহাড়ে দেখা যায়, স্থানীয় বাচ্চাকাচ্চারা ভিড় জমায় ক্যান্ডি, লজেন্সের লোভে। রাস্তায় খাবার জন্য কিছু শুকনো খাবার কিনলাম, পাহাড়ি শিশুদের তাদের পছন্দের লজেন্স কিনে দিয়ে আবার আমরা রওনা দিলাম। ক্ষীরগঙ্গা যাবার রাস্তায় বিচিত্র সব গাছপালা আছে। পথের দুদিকে আপেল,

পাম, কুল গাছ চিনতে পারলাম। পাহাড়ি অনেক গাছ চিনতেও পারলাম না। গ্রামটি অতিক্রম করার পর আমাদের যাত্রাপথ আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রাস্তায় অনেক খচ্চরকে পিঠে করে মাল নিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম। কিছুক্ষণ যাবার পর, রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। স্থানীয় একটা মন্দিরে দেখলাম তাদের কোন উৎসব চলছে। আমরা ছবি তোলার জন্য সেখানে থামলাম। মন্দিরে তখন আরতি চলছিল। আরতি শেষ হবার পর তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শুরু হল। স্থানীয় কয়েকজন আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের সঙ্গে যোগদান করার জন্য। তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। অতি যত্নে তাঁরা আমাদের প্রসাদ খাওয়ালেন। তাঁরা আমাদের জানালেন কিছু পরে অন্ধকার নেমে আসবে, আবহাওয়া বিশেষ ভালো না, তাই সময় নষ্ট না করে দ্রুত বেরিয়ে পড়ুন। আমরা তাঁদের কথা শুনে আবারো বেরিয়ে পড়লাম ক্ষীরগঙ্গার উদ্দেশ্যে। ক্ষীরগঙ্গা ট্রেকের সময় জলের জলতরঙ্গ রিনিঝিনি করে কানে বাজতে থাকে। আশেপাশে নদী,ঝরনা বয়ে চলেছে। সেই সুর কানে ভেসে আসে।

এই সময় মনে হয় বিশাল পাহাড়ের সামনে, প্রকৃতির কাছে শক্তিশালী মানুষ অতি তুচ্ছ!

আমরা যখন প্রায় ক্ষীরগঙ্গার কাছাকাছি তখন বন ঘন হয়ে গেল, আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। গাছগুলি খুব লম্বা ও ঘন হওয়ার ফলে সেইখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। রাস্তার পাশে অচেনা বুনো পাহাড়ি ফুল ফুটেছিল। একটু পরে ক্রমশ আমাদের রাস্তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হওয়ার ফলে আমরা খুব সাবধানে হাঁটছিলাম। পাহাড়ি পোকাকার ডাকে পরিবেশ রহস্যময় হয়ে উঠলো। এইসময় দেখলাম দুজন বিদেশিনী ক্ষীরগঙ্গা থেকে নামছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তাঁদের একজনের বাড়ি ফ্রান্সে, অপরজনের ইসরায়েলে। অনেকক্ষণ হেঁটে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দিলাম। তাঁরা আমাদের জানালেন-“ক্ষীরগঙ্গা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সমস্ত ক্লান্তি হারিয়ে যাবে।” আমাদের বিদায় জানিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। আমরা আবার গুটিগুটি পায়ে এগোতে থাকলাম।

কিছুক্ষণ যাবার পর বরফ পড়তে শুরু করলো, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। আমরা বাধ্য হয়ে একটা জায়গায় থামলাম। আমাদের সামনে পিছনে অনেক যাত্রী ক্ষীরগঙ্গা যাচ্ছিলেন। সকলকে বাধ্য হয়ে থামতে হয়েছিল। স্থানীয় একজন ভদ্রলোক জঙ্গলে কাঠ কাটছিলেন। উনি আমাদের সবাইকে সতর্ক করে বললেন-“একটু পর ঝুপ করে সন্ধ্যা নামবে, তখন অনেক বন্য জন্তু বেরোবে, এখানে তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না, উপরে যাও।” তাঁর কথা শুনে আমরা সকলে পুনরায় হাঁটতে শুরু করলাম। ঝড়-জল-বরফকে সঙ্গী করে আমাদের যাত্রাপথ অতি দুর্গম হয়ে উঠেছিল। অতঃপর শান্তি! যখন ক্ষীরগঙ্গা ছুঁলাম, সত্যিই শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম! এতো সুন্দর

প্রকৃতি! ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না! অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকৃতি! সত্যি বলতে, হঠাৎ করে অপরূপ প্রকৃতি দেখে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। ক্ষীরগঙ্গার উষ্ণ প্রস্রবণ বিখ্যাত। তাই আমরা ঠিক করলাম পরের দিন উষ্ণ প্রস্রবণ দেখব। ক্ষীরগঙ্গার আশ্রমে আমরা ছিলাম। টানা ছয়-সাত ঘণ্টা হেঁটে আমরা সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকলে কাকভেজা হয়ে গিয়েছিলাম। দ্রুত শুকনো জামা পরে, আমরা আগুন জ্বালালাম। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা দ্রুত কমছিল। একবার বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো বরফের উপর পড়ে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে! তবে ঠাণ্ডার ফলে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারলাম না। আশ্রমে রাতের খাবার ছিল ডাল-রুটি। রাতের খাবার খেয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাত্রে বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। কোনো রকমে রাত কাটালাম। সকাল থেকে দেখলাম চারিদিক থমথম করছে। আশ্রমের সামনে এক হাঁটু বরফ জমে আছে। কয়েকজন টুরিস্টকে দেখলাম তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন। কয়েকজন সঙ্গে কথা বললাম, তাঁরা সবাই জানালেন রাস্তায় ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই কেউ থাকবেন না। আমরা ঠিক করলাম নেমে যাবো। কোথায় ঠিক করেছিলাম একদিন ক্ষীরগঙ্গায় থাকবো, আশেপাশে ঘুরবো। অত কষ্ট করে উপরে উঠলাম। কিন্তু হায়! মনের দুঃখে আবার ফিরতি পথ ধরতে হলো।

এক হাঁটু বরফ ভেঙে নামতে কি পরিমাণ কষ্ট হয়েছিল, বোঝাই যাচ্ছে। ভিজে, পিছল রাস্তায় বারবার পা হড়কে যাচ্ছিল। ভয়ে ভয়ে প্রতি পদ ফেলছিলাম। আমাদের সামনে বেশ কয়েকজন কলেজের ছাত্র ছিল, তারা কয়েকবার আছাড় খেলো। একজন ধুপ করে বসে পড়ে তারস্বরে কাঁদতে শুরু করলো। কিছুতেই তার বন্ধুরা তাকে রাস্তা থেকে ওঠাতে পারছিল না। ফলে আমরা এগোতে পারছিলাম না। বেচারী এতো ভয় পেয়েছিল, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছিল না। তখনও কিন্তু সমানে বরফ পড়ছিল। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সেইসময় ক্ষীরগঙ্গা থেকে নামছিলেন। তিনি অনেক বুঝিয়ে ছেলেটিকে দাঁড় করালেন। তারপর তাঁর হাত ধরে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে চললেন। আমরাও তাঁদের পিছু পিছু, দুরন্দুর বৃকে নামতে থাকলাম। আবহাওয়া খারাপ হবার জন্য আমরা ঠিক করেছিলাম, সেই দিন কাটাগ্লা গ্রামে চলে যাবো। তোসে আমাদের কয়েকটা ব্যাগ রাখা ছিল। তাই আমরা দ্রুত নামছিলাম। আমরা যখন তোসে পৌঁছলাম তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বৃষ্টি থামল। আবার আমরা কাকভেজা হয়ে গেলাম। আমাদের কাছে তখন কোনো শুকনো জামা কাপড় ছিল না। শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমরা কাটাগ্লা যাবার গাড়িতে উঠলাম। ঘন অন্ধকার রাস্তায় ড্রাইভার আমাদের নামিয়ে দিয়ে বললেন, “এখান থেকে নীচে নেমে যান। ঐখানে কাটাগ্লা গ্রাম।” ড্রাইভার এরপরে হুশ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমাদের কারো মোবাইলে চার্জ ছিল না। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। দূরে পার্বতী নদীর বয়ে যাওয়ার আওয়াজ

আসছিল। আমাদের নদীর পাশ দিয়ে যেতে হবে। ভাগ্যক্রমে পা পিছলে গেলে, সোজা গিয়ে পড়ব নদীতে! ঠাণ্ডাও ক্রমশ বাড়ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, নীচে নামার। ভিজে রাস্তায় অতি সন্তপণে আমরা এগিয়ে চললাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বেশ কয়েকবার হেঁচট খেললাম। একটা সময় আমরা সকলে হাল ছেড়ে দিলাম! অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে, কী করবো যখন ভাবছি তখন দর্পহারী মধুসূদনের দর্শন পেলাম। একজন ইসরায়েলি ভদ্রলোক হাতে আলো নিয়ে আসছিলেন। তিনি জানালেন আমরা যে হোটেলে যাচ্ছি, উনিও সেখানে যাবেন। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দেবার ভাষা সত্যিই আমাদের কাছে ছিল না। অভিভাবকের মতো পথ প্রদর্শক হয়ে তিনি আমাদের হোটেলে পৌঁছে দেন। একদিন কাটাগ্লায় কাটানোর পর, আমরা নিজেদের বাড়ি ফিরে আসি।

ক্ষীরগঙ্গায় গিয়ে সেবার মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। সেইজন্যই হয়তো আজও গভীর রাতের নিরিবিলিতে ক্ষীরগঙ্গায় কাটানো জোছনাময় বরফ আবৃত পাহাড়ের স্মৃতি মনে ভেসে এলে মন ভালো হয়ে যায়! হয়তো আগামীতে দেশেবিদেশে ভ্রমণ করবো। তবে, ক্ষীরগঙ্গা ভ্রমণ নিঃসন্দেহে সেরা ভ্রমণের তালিকায় থাকবে!

THE PEOPLE'S
UNIVERSITY